জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

# সমবায়

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

# সমবায়

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

## সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
**মোঃ সেলিম ফকির**, এনডিসি
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
**জেবুন নাহার**
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
**মোঃ মিজানুর রহমান**
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

**মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান**
উপনিবন্ধক (পিপি)

**মোঃ সাইফুল ইসলাম**
সহকারী নিবন্ধক (পিপি)

**ফাহমিদা আক্তার লীমা**
সম্পাদক ও সদস্য সচিব

মূল্য
২৫ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
**মনিরুল ইসলাম**

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : +৮৮০ ২২২২-২৪৮০৫৩, ৪৮১১১৮০৫, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

# সূচিপত্র


- সমবায়ে দেড় মাস- আমার দেখা, আমার উপলব্ধি: মোঃ সেলিম ফকির, এনডিসি ৩
- সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা: মো: আহসান কবীর ৬
- কৃষিখাতে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য- বড় ভূমিকা রেখেছে সমবায়: ড. জাহাঙ্গীর আলম ৯
- সমবায় খাতের গণতান্ত্রিক উত্তরণে নির্বাচনের আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ: জেবুন নাহার ১২
- লাভজনক ফসল উৎপাদনে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সফলতা: মোঃ সহিদুল হক, মোঃ নুরুল আনোয়ার ও ড. কিউ আর ইসলাম ১৬
- জুলাই আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ: খ. ম. রেজাউল করিম ১৯
- হিমালয় থেকে আন্তর্জাতিক টেবিলে ইলাম, নেপালের চায়ের গল্প: সাইয়্যেদাতুন নেছা ২২
- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সরকারি দাপ্তরিক কাজের সম্পৃক্ততা, প্রয়োগ সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ বিধান: মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান ২৫
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর: সংগ্রাম, ত্যাগ ও নেতৃত্বের এক প্রতিচ্ছবি ৩০
- তৃণমূল থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায়: প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পথচলা ৩১
- আমানত সুরক্ষা তহবিল কী এবং কেন: মোঃ মিজানুর রহমান ৩২
- সমবায়ে যুবকদের অংশগ্রহণ ও টেকসই উদ্যোগের বিকাশ : আইরিন খানম ৩৫
- নতুন যুগের সমবায় প্রযুক্তি ও সহযোগিতার নতুন অর্থনীতি: প্রকৌশলী ফারহানা ফেরদৌসী ৩৯
- বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার সমবায় ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ: এম. এম. মোর্শেদ ৪২
- ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি সদস্য ও সমবায় সমিতির করণীয়: সৈয়দ জসীম উদ্দিন ৪৪
- সমবায় মালিকানায় অনাবাদি জমি চা-চাষে সমবায়ীরা স্বাবলম্বী: মোঃ সাইফুল ইসলাম ৪৮
- সমবায়ে পথযাত্রা সৎ, যোগ্য উদ্যোক্তা: আব্দুল ওয়াদুদ রতন ৫১
- একটি স্বপ্নযাত্রা আমাদের পূর্বসূরি, আমরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম! : রবীন ভাবুক ৫২
- সমবায় সংবাদ ৫৫

# সমবায়ে দেড় মাস আমার দেখা, আমার উপলব্ধি

মোঃ সেলিম ফকির, এনডিসি

সমবায় অধিদপ্তরে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম দেড় মাস খুব বড় সময় নয়, কিন্তু এই অল্প সময়ে সমবায় খাতের সম্ভাবনা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সম্মিলিত উন্নয়নচিন্তার একটি কার্যকর ক্ষেত্র সমবায়। এখানে মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় পুঁজিতে, বিচ্ছিন্ন মানুষ সংগঠিত শক্তিতে এবং কর্মহীন মানুষ নতুন জীবিকার সন্ধান পেতে পারে। তাই সমবায় অধিদপ্তরের কাজকে কেবল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখার সুযোগ নেই। আমাদের প্রয়োজন এখাতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র অন্বেষণ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।

সমবায়ের বিদ্যমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে যোগদানের পর হতে আমি নওগাঁ, বগুড়া, রাজশাহী, নরসিংদী, কুমিল্লা, ফেনী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমবায় কার্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছি। কোথাও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি, কোথাও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখেছি, কোথাও দুগ্ধ সমবায়ের উদ্যোগ, কোথাও মৎস্যজীবী সমবায়, কোথাও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কোথাও শিল্প সমবায়ের সম্পদ ও সংকটকে উপলব্ধি করেছি। সরকারি সফরসূচিতে এগুলো আলাদা আলাদা কর্মসূচি। কিন্তু আমার কাছে তা সমবায় খাতের একটি জীবন্ত ছবি। যা কখনো ব্যর্থতা, কখনো আবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প হয়ে সামনে আসে।

মাঠ পরিদর্শনে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হয়েছে। কাগজে সমিতি থাকা আর কার্যকর সমবায় হওয়া এক বিষয় নয়। কোথাও সদস্য আছে, কিন্তু অংশগ্রহণ কম; কোথাও সম্পদ আছে, কিন্তু ব্যবহার নেই; কোথাও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পরিকল্পনা নেই; কোথাও নিয়ম আছে, কিন্তু চর্চা দুর্বল। আবার কোথাও সীমিত সম্পদ নিয়েও মানুষ নিয়মিত সভা করছে, হিসাব রাখছে, প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, উৎপাদন ও বিপণনে নতুন পথ খুঁজছে। অর্থাৎ সমস্যা আছে, সম্ভাবনাও আছে। আমাদের দায়িত্ব হলো সম্ভাবনাকে সংগঠিত করা এবং দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে তড়িৎ সমাধান করা।

সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় সমবায় খাতের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বড়। দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার সমবায় সমিতি এবং প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষের বেশি সদস্য এই খাতের সঙ্গে যুক্ত। শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, কার্যকরী মূলধন ও সম্পদের পরিমাণ বিবেচনায় এটি দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশের সংগঠিত অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্র। এই সংখ্যা শুধু প্রশাসনিক পরিসংখ্যান নয়; এটি সম্ভাবনার পাশাপাশি দায়িত্বেরও স্মারক। সঠিক নীতিসহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে এই খাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তরকে শুধু নিবন্ধনকারী বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নয়। আইন প্রয়োগ, নিরীক্ষা ও তদারকির পাশাপাশি অধিদপ্তরকে হতে হবে সক্ষমতা-সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। একটি সমিতি কীভাবে ব্যবসা পরিকল্পনা করবে, কীভাবে সঠিক হিসাব রাখবে, কীভাবে সদস্যদের সক্রিয় করবে, কীভাবে পণ্য বাজারে নেবে, কীভাবে সম্পদ রক্ষা ও ব্যবহার করবে এসব বিষয়ে অধিদপ্তরের নীতিসহায়তা জরুরী। এখানে অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁদের অনেকের অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা ও মাঠজ্ঞান প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁদের কাজের পরিধির তুলনায় জনবল, লজিস্টিক সহায়তা, পদোন্নতির সুযোগ সীমিত, তথ্য ব্যবস্থাপনা এখনও পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভর নয়। তাছাড়া সমবায়ের জটিল আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত সমস্যার তুলনায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন আরও বেশি। তাই সমবায় খাতকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু সমিতিকে নয়, অধিদপ্তরকেও শক্তিশালী করা জরুরী। সমবায় খাতের আগামী দিনের পরিবর্তন অনেকটাই নির্ভর করবে অধিদপ্তরের এই মানবসম্পদের ওপর।

বগুড়া ও চট্টগ্রামে দুগ্ধ সমবায় কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র খামারি পরিবারগুলো দুধ উৎপাদন করে। একজন ক্ষুদ্র খামারির হাতে যদি নিয়মিত আয় আসে, তার প্রভাব পড়ে শিশুর শিক্ষা, পরিবারের পুষ্টি, নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং স্থানীয় বাজারে। মিল্ক ভিটার দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও দুগ্ধ কারখানাসমূহের মাধ্যমে সমবায়ী দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণকে আধুনিক সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবে। চট্টগ্রামে মৎস্যজীবী সমবায়, ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমবায় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেও একই উপলব্ধি হয়েছে। সমবায় খাত মূলত: সকল জীবিকার একটি সম্মিলিত রূপ। এর ভেতরে কৃষি আছে, মৎস্য আছে, দুগ্ধ আছে, ঋণ আছে, শিল্প আছে, সেবা আছে, শহুরে সমবায় আছে, আবার প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক মানুষের সংগঠনও আছে। এই বহুমাত্রিকতাকে

**সমবায় খাতকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু সমিতিকে নয়, অধিদপ্তরকেও শক্তিশালী করা জরুরী। সমবায় খাতের আগামী দিনের পরিবর্তন অনেকটাই নির্ভর করবে অধিদপ্তরের এই মানবসম্পদের ওপর।**

বোঝা জরুরি। এক নীতিতে সব সমিতি চালানো যায় না; খাতভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক ও সক্ষমতাভিত্তিক সহায়তা প্রয়োজন। এসব মাঠসফর আরেকটি বিষয় শিখিয়েছে। সমবায়ের ইতিহাস আছে, সম্পদ আছে, মানুষের আবেগ আছে; কিন্তু সেই সম্পদকে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তর করতে হলে পেশাদার ব্যবস্থাপনা, আইনি সুরক্ষা এবং দায়বদ্ধ নেতৃত্ব দরকার। শুধু অতীতের গৌরব দিয়ে ভবিষ্যৎ তৈরি হয় না; ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হয় বর্তমানের কাজ দিয়ে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, যুব উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রম, সমাজসেবা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্থানীয় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিজ নিজ খাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। পাশাপাশি কাজ করছে একটি বিশাল সংখ্যক দেশি-বিদেশি এনজিও। যাদের লক্ষ্য প্রায় একই- আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রান্তিক মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। আমার কাছে মনে হয়, এই লক্ষ্যসমূহ সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে আরও সমন্বিত, অংশগ্রহণমূলক ও টেকসইভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ আছে। কারণ সমবায় শুধু সেবা গ্রহণের প্ল্যাটফর্ম নয়; এটি সদস্যদের মালিকানা, সঞ্চয়, সিদ্ধান্তগ্রহণ, জবাবদিহি ও সম্মিলিত উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান। দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি সমবায় সমিতি এবং প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষের বেশি সদস্যের উপস্থিতি বিবেচনায় সমবায় খাতকে উন্নয়ন কর্মসূচির প্রান্তিক সহযোগী নয় বরং একটি কার্যকর বাস্তবায়ন কাঠামো হিসেবে দেখা প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সম্পদ সীমিত। তাই একই সম্পদ দিয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি সংগঠিত সামাজিক পুঁজি কাজে লাগাতে হবে। জীবনমানের বৈষম্য যত বাড়ে, সামাজিক সুরক্ষার অনিশ্চয়তাও তত বাড়ে। সমবায় এ জায়গায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি দারিদ্র্য বিমোচনকে শুধু ভাতা বা সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না বরং মানুষকে উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বাজার ও নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত করে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের পথ তৈরি করে। জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২-তেও সমবায়কে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের রূপকল্প- "টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন" এবং অভিলক্ষ্য "সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা" - এই পরিবর্তন ভাবনার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখন জরুরি হলো পরিবর্তনের সুযোগটি তৈরি

*মোঃ সেলিম ফকির এনডিসি, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এবং জনাব ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষু, পুরুস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ী, দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সাক্ষাতকালীন একটি মুহূর্ত।*

করা এবং তা কাজে লাগানো।

আমার পরিকল্পনা খুব জটিল নয়, কিন্তু স্পষ্ট। প্রথমত, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমিতির বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণপূর্বক নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্রুততার সাথে হ্রাস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সম্ভাবনাময় কিন্তু দুর্বল সমবায় সমিতির জন্য পুনরুজ্জীবন-সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি সমবায় এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বিবেচিত হতে পারে। তৃতীয়ত, উৎপাদনমুখী সমবায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সমবায় সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এখাতে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা ও উন্নয়ন বাজেটে সমবায় অধিদপ্তরের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেয়া; চতুর্থত, নিরীক্ষা, হিসাব, সদস্য তথ্য ও তদারকিতে প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়াতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, সমবায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য ও গৌরবগাঁথাকে সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে।

আমি প্রত্যাশা করি সমবায় অধিদপ্তর সেলক্ষ্যে নব উদ্যোগে কাজ করবে। যার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আত্মনির্ভরতা অর্জন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তব রূপ পাবে। এটি কোনো একক প্রকল্প বা একদিনের কাজ নয়; বরং ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। অধিদপ্তরের সেবা সহজ ও জনবান্ধব, তথ্যব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য, প্রশিক্ষণ ফলাফলমুখী এবং সমবায় সমিতিগুলো বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করাই হবে আমার কর্মকালীন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ প্রচেষ্টায় সফল হলে সমবায় অধিদপ্তর প্রান্তিক মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

**মোঃ সেলিম ফকির**, এনডিসি: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

# সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা

মো: আহসান কবীর

জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন মূলত দেশের সকল সমবায়ের অভিভাবক। সমবায় আন্দোলনের মুখপাত্র এবং সমবায়ের শীর্ষ সংস্থা (Apex body) হিসাবে দেশের সকল সমবায়ের পক্ষে বার্গেনিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ সমবায় অধিদপ্তর এবং সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমবায়ীদের মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে দেশের সমবায় আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

## আইনগত মর্যাদা

জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দেশের প্রচলিত অন্যান্য সমবায় থেকে ভিন্ন ধরনের সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। সমবায় সমিতি আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যাহার সদস্য হইবে ইউনিয়ন, জেলা, বিভাগ ও দেশব্যাপী কর্ম এলাকা বিশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতি; জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন উহার সদস্য সমিতির সহায়ক হিসাবে কাজ করিবে এবং উহার কার্যাবলি ও ব্যবস্থাপনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

## জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা

জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন সমবায় আন্দোলন বেগবান, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবায় সমিতিগুলোর পক্ষে Advocacy এবং সমর্থনকারী একটি শীর্ষ সংস্থা (Apex body) হিসেবে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তৃণমূল মানুষের সাথে কার্যকর যোগাযোগ, সহযোগিতা, কারিগরি অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সাথে সরকারের মেলবন্ধন, অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

## জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের কার্যাবলি

জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের মূল কাজ হচ্ছে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করা এবং শক্তিশালী করা। এর লক্ষ্য কেবল সমবায়ের উন্নয়নে সহায়তা করা নয়, বরং সমবায় নীতির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে কার্যকর এবং দক্ষতার সাথে পরিচালিত হওয়াও নিশ্চিত করা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দরিদ্র কৃষককুলকে অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনের ঋণের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য Cooperative Credit Society Act জারির মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এই আন্দোলনকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে সমবায়গুলো জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায়, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

## ইউনিয়নের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে

**১. সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা**
ইউনিয়নের লক্ষ্য হলো নতুন সমবায় গঠনকে উৎসাহিত করে এবং বিদ্যমান সমবায়গুলির সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করে একটি শক্তিশালী সমবায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

**২. সহযোগিতামূলক নীতিমালার প্রচার**
আত্ম-সহায়তা, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয় এমন সহযোগিতামূলক নীতিমালা সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

**৩ অ্যাডভোকেসি এবং নীতি উন্নয়ন**
সক্রিয়ভাবে নীতিগত অ্যাডভোকেসিতে জড়িত থাকতে হবে যাতে সমবায়গুলো উপকৃত হয় এবং সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলন বিকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

**৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ**
ইউনিয়নের কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, কারণ এর মাধ্যমে জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে সমবায়গুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

**৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**
বৈশ্বিক ভূমিকার অংশ হিসেবে ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে পারে। পারস্পরিক এক্সপোজার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়কে উৎসাহিত করতে হবে। সমবায় পণ্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সহযোগী এবং প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পারে।

ইউনিয়ন একটি সমবায় বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করবে যেখানে সকল সদস্য - কৃষক, শ্রমিক বা ভোক্তা - পারস্পরিক সহায়তা, অর্থনৈতিক লাভ এবং সামাজিক সম্পৃক্তি থেকে উপকৃত হবেন। এর দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বাইরেও বিস্তৃত; সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য অনুঘটক হিসেবে সমবায়কে কল্পনা করতে হবে।

ইউনিয়নের কার্যাবলি সারা দেশে সমবায়ের জন্য একটি বিস্তৃত সহায়তা কাঠামো হিসেবে কাজ করবে।

## ইউনিয়ন যেসব সেবা প্রদান করতে পারে

**১. অ্যাডভোকেসি এবং নীতিগত প্রভাব**
ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে সমবায়ের অধিকারের পক্ষে Advocacy করা। ইউনিয়ন সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে নীতিমালা প্রভাবিত করতে এবং সমবায় সমিতির পক্ষে আইন পাস করা নিশ্চিত করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অনুকূল কর ব্যবস্থা, আর্থিক প্রণোদনা এবং সমবায় খাতকে শক্তিশালী করে এমন সংস্কারের জন্য লবিং করা।

**২. সমবায় শিক্ষা এবং সচেতনতা প্রচারণা**
সমবায় নীতিমালা প্রচারের লক্ষ্যে সমবায় উদ্যোগের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষামূলক প্রচারণা পরিচালনা। এই প্রচারণাগুলো জনসাধারণ, নীতিনির্ধারক এবং সম্ভাব্য সমবায় সদস্যদের সমবায় কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল উন্নত করতে পারে সে সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ডিজাইন করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে যাতে জনগণকে সমবায় কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচিত করা যায় যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত করতে পারে, যেমন দুগ্ধ, কৃষি এবং ভোক্তা সমবায়।

**৩. আইনি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান**
সমবায় সমিতিগুলোকে আইনি ও প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা সমবায় সমিতি আইন এবং অন্যান্য নিয়মকানুন মেনে চলে।

**৪. সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং বাজার সংযোগ**
ইউনিয়নের আরেকটি অপরিহার্য কাজ হলো সমবায়গুলোর জন্য ব্যবসা বাণিজ্য ও বাজার সংযোগ সহজতর করা। ক্রেতা ও সরবরাহকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সমবায়ের নেটওয়ার্ক এবং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, বাজারে আরও কার্যকরভাবে প্রবেশাধিকার পেতে সহায়তা করা। এটি বিশেষ করে ছোট সমবায়গুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেমন কৃষক উৎপাদক সংস্থা, যারা বৃহত্তর বাজারে পৌঁছাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। ইউনিয়নের এই প্রচেষ্টা সমবায় বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং বৃহত্তর বাণিজ্যিক উদ্যোগের সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

**৫. সমবায় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি**
দক্ষ সমবায় নেতৃত্ব বিকাশের উপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে দক্ষ সমবায় নেতৃত্বের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পেশাদার সমবায় নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই সীমিত। ইউনিয়ন নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে তরুণ এবং উদীয়মান সমবায় নেতাদের আধুনিক দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

> **জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।**

আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, সরকারি বরাদ্দ এবং সিডিএফ থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করা যেতে পারে।

৬.

**কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি**
বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার, ব্যক্তি সদস্য ১ কোটির অধিক। মোট কার্যকরী মূলধন প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা,যা সমবায়ীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজি। এই পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষের সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমিতি পর্যায়ে সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক, পিকেএসএফ, এসএমই ফাউন্ডেশন ইত্যাদি সংস্থার সাথে নীতি সহায়তা ও অর্থনৈতিক সহায়তার প্রস্তাব নিয়ে কাজ করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন।

জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন সমবায়ের প্রচার ও উন্নয়নে একটি চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, শিক্ষা, প্রচারণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, সমবায় মডেলের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে, ইউনিয়ন একটি সমবায় বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারে যা কেবল অর্থনৈতিকভাবে দক্ষই নয় বরং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণতান্ত্রিকও। ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগগুলো সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করতে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম।

## বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার। এর অধিকাংশই অকার্যকর।
২. আয়ের কোনো উৎস না থাকায় আর্থিক ভিত্তি খুবই দুর্বল।
৩. ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের অভাব এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।
৪. দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো পেশাদার জনবল না থাকা।
৫. ইউনিয়নের কার্যক্রম ও গুরুত্ব সম্পর্কে সদস্য সমিতিগুলোর অজ্ঞতা।
৬. সরকারি সমর্থনের অভাব।
৭. অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক আইনগত কাঠামো।

## চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১. অকার্যকর সমবায় সমিতিগুলোকে কার্যকর করা অথবা নিবন্ধন বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২. আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, সরকারি বরাদ্দ এবং সিডিএফ থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
৩. পেশাদারিত্ব আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর তার অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে।
৪. সঠিক গণতান্ত্রিক পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ এবং আইন ও বিধিবিধান যথাযথ পরিপালন করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকতে হবে।
৫. ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যক্রম ও গুরুত্ব সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে ইউনিয়ন নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।
৬. সরকারি সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের জন্য ইউনিয়ন বার্গেনিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে। নিয়ন্ত্রণমূলক আইনগত কাঠামো পরিবর্তনের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

**মো: আহসান কবীর:** অতিরিক্ত নিবন্ধক (অব:), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

# কৃষিখাতে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য বড় ভূমিকা রেখেছে সমবায়

ড. জাহাঙ্গীর আলম

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন খাতে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান খাতটি হলো কৃষিখাত। অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে খাদ্য আমদানি করা হতো ১৫ থেকে ২০ লাখ টন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় কৃষির উৎপাদন। ফলে ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ লাখ টন। এটি ছিল মোট উৎপাদনের প্রায় ত্রিশ শতাংশ। বর্তমানে সে ঘাটতির হার নেমে এসেছে ১৫ শতাংশেরও নিচে। স্বাধীনতার পর দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টন। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৬০ লাখ টনের উপরে। গত ৫৪ বছরে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ হারে। যে কৃষক আগে খাদ্য ঘাটতিতে ছিল সে এখন খাদ্যে উদ্বৃত্ত। যে শ্রমিকের দাবি ছিল দৈনিক ৩ কেজি চালের সমান মজুরি, সে এখন কাজ করে ১০ কেজি চালের সমান দৈনিক মজুরিতে। কী কৃষক, কী শ্রমিক-কারোরই আর তেমন খাদ্যের অভাব হয় না। না খেয়ে দিন কাটে না কোনো মানুষেরই। কৃষিখাতে এখন উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। বর্তমানে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বাংলাদেশের স্থান হলো সবার উপরে। তাছাড়া পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয়, গম উৎপাদনে সপ্তম ও আলু উৎপাদনে অষ্টম বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এ নাগাদ চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চারগুণ, গম দুই গুণ, ভুট্টা ১০ গুণ ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। আলু, মৎস্য, মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত। চিরকালের দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা আর

ক্ষুধার দেশে এখন ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে। প্রতি বছর এ দেশে মানুষ বাড়ছে প্রায় ২০ লাখ। কৃষিজমি কমছে প্রায় সাড়ে ৪৮ হাজার হেক্টর। তারপরও জনপ্রতি সরবরাহ কমছে না কৃষিপণ্যের। বরং তা বাড়ছে নিরন্তর। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জনপ্রতি আমাদের খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা ছিল দৈনিক ৪৫৬ গ্রাম, ২০০০ সালে তা ৫২২ গ্রাম এবং ২০২০ সালে তা ৬৮৭ গ্রামে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ দ্রুত অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি। সম্প্রতি নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে আমাদের কৃষিখাতে। আগের খোরপোশ পর্যায়ের কৃষি এখন পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক কৃষিতে। এক নীরব বিপ্লব সূচিত হয়েছে কৃষির প্রতিটি উপখাতে।

দানাদার খাদ্যশস্যের পর আলুর উৎপাদনে বিপুল উদ্বৃত্ত অর্জনের বিষয়টি উল্লেখ করার মতো। দেশের মানুষের দৈনিক জনপ্রতি আলুর চাহিদা হচ্ছে ৭০ গ্রাম, প্রাপ্যতা অনেক বেশি। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে আমাদের আলুর মোট উৎপাদন ছিল প্রায় অর্ধকোটি টন। এখন তা ১ কোটি ২৫ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে এখন আলু রফতানি হচ্ছে বিদেশে। তাতে প্রতি বছর গড়ে আমাদের আয় হচ্ছে প্রায় ২০০ কোটি ডলার। তাছাড়া আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে এর ব্যবহারও বহুমুখী হচ্ছে। আগে আলুর ব্যবহার হতো মূলত সবজি হিসেবে। এখন তা চিপস ও পটেটো ক্রেকার্স হিসেবেও অনেক সমাদৃত। বিদেশিদের মতো অনেক বাংলাদেশিও এখন মূল খাদ্য হিসেবে রোস্টেড পটেটো খেতে পছন্দ করেন। আলু উৎপাদনে গত ২৫ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ।

খাদ্যশস্যের আর একটি বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে সবজি উৎপাদনে। ২০০৮-০৯ সাল থেকে ২০২০-২৪ সাল পর্যন্ত সবজি উৎপাদন প্রতি বছর গড়ে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান মোট উৎপাদন ২৪২ লাখ টন। চীন ও ভারতের পর বিশ্বে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। মৌসুমের শুরুতে বাজারে সবজির দাম ভালো থাকায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবজি রফতানি সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশের কৃষকগণ এখন সবজি চাষে বেশ উৎসাহিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ফলের উৎপাদনে। বর্তমানে এ দেশে ফলের উৎপাদন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টন। ফল উৎপাদনে পৃথিবীর প্রথম সারির ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। গত ২ দশক ধরে এ দেশে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ১১ শতাংশের উপরে। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলের মাথাপিছু প্রাপ্যতা সম্প্রতি অনেক বেড়েছে। ২০০৬ সালে আমাদের মাথাপিছু দৈনিক ফল গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৫৫ গ্রাম, ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৫ গ্রামে। তাতে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে আমাদের পুষ্টিহীনতা। বর্তমানে আমাদের দেশে আমের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। চিরায়তভাবে গড়ে ওঠা রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুরের বাগানগুলো ছাপিয়ে এখন প্রচুর আম উৎপাদিত হচ্ছে সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায়। তাছাড়াও বরেন্দ্র অঞ্চলের অনেক ধানী জমি পরিণত হয়েছে আম বাগানে। অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা হচ্ছে নতুন ফল স্ট্রবেরি। আরো চাষ করা হচ্ছে রাম্বুতান, ড্রাগন ফল ও এভোকেডো। মানুষ আপেলের পরিবর্তে বেশি করে খাচ্ছে কাজী পেয়ারা। তাতে বিদেশি ফলের আমদানি হ্রাস পাচ্ছে। সাশ্রয় হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা।

এ দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। দীর্ঘমেয়াদে এর আবাদি এলাকা কমেছে। তবে একরপ্রতি উৎপাদন বেড়েছে। ২০১০ সালে পাটের জিন রহস্য উন্মোচনের ফলে এর উৎপাদন বৃদ্ধির পথ আরো সুগম হয়েছে। বিশ্ববাজারে এখন পাটের চাহিদা বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ। সাম্প্রতিক করোনাকালেও পাটের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল বেশ চড়া। এখন দেশে কৃষকের খামার প্রান্তে কাঁচা পাটের মূল্য ৩ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা প্রতি মণ। এটা বেশ লাভজনক মূল্য। বর্তমানে দেশে পাটের উৎপাদন প্রতি বছর ৭৫ থেকে ৮৫ লাখ বেল। আগামীতে এর উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। অদূর ভবিষ্যতে আবার ঘুরে দাঁড়াবে আমাদের পাট খাত।

কেবল শস্যখাতেই নয়, কৃষির সকল উপখাতেই বিপুল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে এ দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৫ লাখ টন। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লাখ টনে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে প্রাপ্ত মাছের হিস্যা মাত্র ১৫

শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত মাছের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ সরবরাহ আসে মুক্ত জলাশয় থেকে এবং ৫৭ ভাগ আসে বদ্ধ জলাশয় থেকে। সামুদ্রিক মৎস্যের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ জোগান আসে আর্টিশনাল বা চিরায়ত আহরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। আর বাকি ১৮ শতাংশ আসে ট্রলারকেন্দ্রিক শিল্পায়িত আহরণের মাধ্যমে। বছরের পর বছর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের হিস্যা হ্রাস পেয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ আহরণের হিস্যা বেড়েছে। এর কারণ, সামুদ্রিক আহরণের প্রবৃদ্ধির হার কম, অভ্যন্তরীণ আহরণের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে বদ্ধ জলাশয় তথা চাষাধীন জলাশয় থেকে আহরণের প্রবৃদ্ধির হার বেশি বিধায় মোট মৎস্য উৎপাদনে এ খাতের হিস্যা দ্রুত বেড়েছে। গত ৪০ বছরে (১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে মৎস্য আহরণের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৭, ৮.৫৭ এবং ৩.৯৪ শতাংশ। এ সময় মাছের মোট উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৫ শতাংশ হারে। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাশ, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। তাতে অভ্যন্তরীণ পুকুর-দিঘিতে হেক্টর প্রতি মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য খাতের উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইলিশের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। ২০০৮-০৯ সালে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লাখ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ মেট্রিক টনে।

পুষ্টির অন্যান্য উপাদান ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদনে উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশ এখন ডিম ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ম্ভর। দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো ঘাটতি আছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। তবে যে হারে উৎপাদন বাড়ছে তাতে এর ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে অচিরেই। বর্তমানে (২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য অনুসারে) মাংসের উৎপাদন ৯২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। জনপ্রতি বার্ষিক প্রাপ্যতা ৫৪ কেজি। ডিমের উৎপাদন ২৩৭৫.৯৭ কোটি। বার্ষিক জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১৩৫টি। দুধের উৎপাদন ১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। জনপ্রতি বার্ষিক প্রাপ্যতা ৮৫ লিটার। তবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে মাংস, ডিম ও দুধের দাম বেশি। প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ হ্রাস করে ভোক্তা পর্যায়ে পশু-পাখি উপজাতের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন প্রযুক্তির ধারণ উৎসাহিত করা উচিত।

কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত বন। এ খাতে বৃক্ষের মোট আচ্ছাদিত এলাকা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫/২০ বছর আগে দেশের ৭/৮ শতাংশ এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির আওতায় ছিল বলে ধরে নেয়া হতো। এখন তা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৪৫ শতাংশে। বৃক্ষরাজী থেকে মানুষের পুষ্টি গ্রহণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বনসম্পদের আরও দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার এখন অনেক এগিয়েছে। ভূমি কর্ষণ, ফসল কর্তন ও মাড়াই, ধান ভানা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এখন কায়িক শ্রমের ব্যবহার সীমিত হয়ে আসছে। বাড়ছে যন্ত্রের ব্যবহার। স্বাধীনতার পর ভূমি কর্ষণের ৯০ শতাংশই সম্পন্ন করা হতো কাঠের লাঙল দিয়ে। ব্যবহার করা হতো পশুশক্তি। এখন পশুশক্তির ব্যবহার হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ৫ শতাংশে। বাকি ৯৫ শতাংশই আবাদ হচ্ছে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। ধান কাটা ও মাড়াই ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার এখন বেশ প্রচলিত। তবে তার পরিধি এখনও বেশ সীমিত। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে চলছে শ্রমিক সংকট। তাতে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে শ্রমিকের মজুরি। তদুপরি ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে সময়ক্ষেপণ, অপচয় ও অদক্ষতার কারণে কৃষির উৎপাদনে লাভজনকতা হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত করা দরকার।

বাংলাদেশে কৃষির বিভিন্ন উপখাতে এ নাগাদ যে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার পেছনে ছিল ষাট এবং সত্তর দশকের সবুজ বিপ্লব। চিরায়ত কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম তাতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে তাতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে কৃষি সমবায়। এর মাধ্যমে কৃষক অর্থের সংস্থান করেছে, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও সেচের ব্যবস্থা করেছে। উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে সহায়তা পেয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে পাশ কাটিয়ে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সক্ষমতা অর্জন করেছে। তারা আধুনিক কৃষিকাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাছাড়া পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সকল বৈপরীত্যকে জয় করার মনোবল সঞ্চারিত হয়েছে।

ষাট এর দশকে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে। এর সুতিকার ছিল কুমিল্লা।

কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার এখন অনেক এগিয়েছে। ভূমি কর্ষণ, ফসল কর্তন ও মাড়াই, ধান ভানা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এখন কায়িক শ্রমের ব্যবহার সীমিত হয়ে আসছে। বাড়ছে যন্ত্রের ব্যবহার।

এর মাধ্যমে কৃষকদের একত্র করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদনে দৃশ্যমান উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় ছিল কুমিল্লা একাডেমি (বার্ড)। স্বাধীনতার পর তা সারা দেশে সম্প্রসারিত হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে। বর্তমানে কৃষি সমবায় কৃষির আধুনিকায়ন, যন্ত্রায়ন, অর্থায়ন, সার্বিক উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সংঘটিত কার্যক্রম। এর প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষি আজ সারা বিশ্বে একটি সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে। শুধু মাঠের শস্য উৎপাদনে নয়, পশু-পাখি, মৎস্য ও বন সম্পদ উন্নয়নেও সমবায়ের ভূমিকা গৌরব দীপ্ত।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমদানি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশগুলো এক্ষেত্রে খুবই অরক্ষিত। সেদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা তেমন ভালো নয়। বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৭৯ শতাংশ। এ হার খুবই কম। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য এ হার ন্যূনতম পক্ষে ৪ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে একটি রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এ বিষয়ে নতুন সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা দরকার।

**ড. জাহাঙ্গীর আলম:** একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ (ইউজিভি); সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই); সাবেক সদস্য-পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং সাবেক পরিচালক, ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস।

# সমবায় খাতের গণতান্ত্রিক উত্তরণে নির্বাচনের আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ

জেবুন নাহার

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক মডেল নয়, বরং এটি তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় নীতিতে এই খাতের বিশেষ মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সমবায় সমিতির মূল ভিত্তি হলো গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সমবায় সমিতির মূল চালিকাশক্তি হলো এর নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ সদস্যদের ভোটে গঠিত হয়। সমবায় নির্বাচন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এই নির্বাচনে প্রতিটি সদস্যের সমঅধিকার থাকে, যা তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা শেখায়।

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি ভিত্তি প্রদান করে। এই আইনি কাঠামোর অধীনে প্রতিটি নিবন্ধিত সমবায় সমিতিতে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান কেবল একটি বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি সমিতির স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম। যখনই কোনো সমিতিতে নিয়মিত নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়, তখনই সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের স্থবিরতা এবং চরম আর্থিক অনিয়ম দেখা দেয়, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ সমবায়ীদের স্বার্থকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

| ব্যবস্থাপনা কমিটির ধরন | মেয়াদের ব্যাপ্তি | আইনি ভিত্তি |
|---|---|---|
| প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি (নিবন্ধনকালীন) | ২ বছর | ধারা ১৮(৩) |
| নির্বাচিত নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি | ৩ বছর | ধারা ১৮(৪) |
| অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি (অ্যাডহক) | ১২০ দিন | ধারা ১৮(৫) |
| নির্বাচিত সদস্যের টানা সর্বোচ্চ মেয়াদ | ৩টি মেয়াদ (৯ বছর) | ধারা ১৮(৮) |

## ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যকাল

সমবায় আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি হলো সমিতির প্রধান নির্বাহী অঙ্গ। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা সমিতির উপআইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিবন্ধনের সময় নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ২ বছর হলেও পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রতিটি কমিটির মেয়াদ হয় ৩ বছর। মেয়াদের এই ধরাবাঁধা নিয়ম রাখা হয়েছে যাতে নেতৃত্বে নিয়মিত পরিবর্তন আসে এবং নতুন নতুন ধারণা ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটে।

একটি নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৬০ দিন আগেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়। যদি কোনো কমিটি তার মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে ধারা ১৮(৫) অনুযায়ী উক্ত কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিবন্ধক সেখানে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করেন। এই আইনি কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে অনির্দিষ্টকাল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ না থাকে এবং সমবায়ের গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় থাকে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা সমিতির উপআইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে উক্ত সংখ্যা ন্যূনতম ৬ ও সর্বোচ্চ ১২ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সর্বদাই ৩ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে। (বিধি ২৩)

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর বিধি ২২(৪) অনুযায়ী, কোনো সদস্য ধারাবাহিকভাবে ৩টি মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না । যদি কোনো সদস্য তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করেন বা তাকে অপসারণ করা হয়, তবে সেই খণ্ডকালীন সময়টিও একটি পূর্ণ মেয়াদ হিসেবে গণ্য হবে।

## নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিটির ভূমিকা

**১. নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন (Election Committee)**

একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমবায় বিধিমালা ২০০৪-এর বিধি ২৬ ও ২৭ অনুযায়ী একটি স্বাধীন "নির্বাচন কমিটি" গঠনের বিধান রয়েছে। এই কমিটির গঠন নির্ভর করে সমিতির আর্থিক সক্ষমতা বা পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ওপর।

**স্বল্প মূলধনী সমিতি:** যে সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৫০,০০০ টাকার কম, তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৪০ দিন আগে ৩ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করবে ।

**বৃহৎ ও উচ্চতর সমিতি:** জাতীয় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি শেয়ার মূলধনসম্পন্ন প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধক (Registrar) নিজে নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৫০ দিন আগে নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে হয় এবং নিবন্ধক নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৪০ দিন আগে সরকারি কর্মকর্তা বা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ৩ সদস্যের নির্বাচন কমিটি গঠন করেন।

**২. নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা**

নির্বাচন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর ভোট গ্রহণের অন্তত ৩০ দিন আগে বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করবে । তফসিলে অবশ্যই মনোনয়নপত্র বিতরণ, দাখিল, বাছাই, আপিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দের সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে ।

**৩. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধন**

ভোটার তালিকা নির্বাচনের প্রাণ। বিধি ৩০ ও ৪৪ অনুযায়ী, বর্তমান কমিটি নির্বাচনের নোটিশ জারির পূর্বে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তা সমিতির কার্যালয়ে প্রকাশ করবে। এই তালিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সদস্যদের আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকে। ২০২০ সালের সংশোধনী অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিবন্ধকের কাছে বিধি মোতাবেক আপিল করতে পারেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

## প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং ভোটাধিকার

সমবায় আইনের ১৯ ধারা এবং বিধিমালার ২৪ বিধি অনুযায়ী প্রার্থীর যোগ্যতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন সদস্যকে প্রার্থী হতে হলে ২১ বছর পূর্ণ হতে হবে এবং প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে তাকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অন্তত ১২ মাসব্যাপী এবং কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে অন্তত ৩ বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সদস্য থাকতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির অন্তত দুটি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

## অযোগ্যতার প্রধান কারণসমূহ

**ঋণ খেলাপি:** কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ঋণ পরিশোধে খেলাপি হলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে, ঋণ খেলাপি সদস্য সমিতি যদি খেলাপি ঋণের ৭৫% মনোনয়ন

| তফসিলের পর্যায় | সময়সীমা (উদাহরণ) | গুরুত্ব |
|---|---|---|
| মনোনয়নপত্র বিতরণ | ২-৩ দিন | সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান |
| মনোনয়নপত্র দাখিল | বিতরণের পর নির্দিষ্ট দিন | প্রার্থিতা নিশ্চিতকরণ |
| মনোনয়নপত্র বাছাই | দাখিলের পর ১-২ দিন | যোগ্যতা যাচাই |
| আপিল দাখিল ও শুনানি | বাছাইয়ের পর ২-৩ দিন | প্রশাসনিক প্রতিকার |
| চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা | আপিল নিষ্পত্তির পর | প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ধারণ |
| ভোট গ্রহণ | নির্ধারিত তারিখ | চূড়ান্ত রায় |

দাখিলের পূর্বে পরিশোধ না করে, তবে সেই প্রতিনিধি অযোগ্য ঘোষিত হবেন। এমনকি সরকারি পাওনা যেমন সমবায় উন্নয়ন তহবিল (CDF), অডিট সেস বা নিরীক্ষা ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলেও কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না ।

**ফৌজদারি দণ্ড:** কোনো ফৌজদারি অপরাধে অন্তত ২ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং মুক্তি লাভের পর ৫ বছর অতিবাহিত না হলে তিনি অযোগ্য।

**স্বার্থের সংঘাত:** সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারী, ঠিকাদার বা সমিতির লাভজনক কোনো পদের অধিকারী ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

**অন্যান্য:** দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া, অপ্রকৃতিস্থ হওয়া বা একই সঙ্গে একাধিক পদে মনোনয়ন জমা দেওয়া।

এছাড়াও সমবায় আইনের ১৭(৬) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আয়োজনে ব্যর্থ হয়, তবে উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ পরবর্তী ৩ বছরের জন্য নির্বাচনে লড়ার অযোগ্য ঘোষিত হতে পারেন।

## ভোটাধিকার

সমবায় সমিতির নির্বাচনে "একজন সদস্য, একটি ভোট" নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়

১. **সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে (প্রক্সি ভোট নিষিদ্ধ)**

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১-এর ধারা ৩৬(১) অনুযায়ী, প্রাথমিক সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রক্সির (Proxy) মাধ্যমে ভোট প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রত্যেক সদস্যকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের ভোট প্রদান করতে হয়।

একজন সদস্যের কেবল একটিই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে।

২. **কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে (ডেলিগেট/প্রতিনিধি)**

যদি কোনো সমবায় সমিতির সদস্য অন্য একটি সমবায় সমিতি হয় (যেমন- কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতি), তবে সেখানে প্রতিনিধি বা ডেলিগেটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যায়। বিধিমালা ২০০৪-এর ৩৩ (৩) বিধি অনুযায়ী এর নিয়মগুলো হলো:

**ক্ষমতাপত্র (Resolution):** প্রতিনিধি যে সমিতির সদস্য, সেই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করার রেজুলেশন থাকতে হবে।

সত্যায়ন: উক্ত রেজুলেশন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

**পরিচয়পত্র:** প্রতিনিধিকে 'ফরম-৮' অনুযায়ী একটি পরিচয়পত্র এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র নির্বাচন কমিটির কাছে জমা দিয়ে ভোটদানের অনুমতি নিতে হয়।

৪. **শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম**

বিধি ৩৩ (৮) অনুযায়ী, যদি কোনো ভোটার অন্ধ বা শারীরিকভাবে এমন অক্ষম হন যে তিনি একা ভোট দিতে পারছেন না, তবে:

তিনি নির্বাচন কমিটির অনুমতি নিয়ে তার মনোনীত একজন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারেন।

ওই ব্যক্তি তাকে ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিতে বা ভোট বাক্সে ফেলতে সাহায্য করবেন।

## সাধারণ আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ

সমবায় সমিতির নির্বাচনে প্রায়শই কিছু জটিলতা দেখা দেয় যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

**ভোটার তালিকা নিয়ে বিবাদ:** ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত সদস্যদের বাদ দেওয়া বা প্রভাব বিস্তারের জন্য ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা সমবায় নির্বাচনের একটি সাধারণ ব্যাধি। অনেক ক্ষেত্রে মৃত সদস্যদের নামও তালিকায় থেকে যায় যা নির্বাচনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

**নির্বাচনি বিবাদ মীমাংসা:** আইনের ৫০ ও ৫২ ধারা

নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সমবায় আইন, ২০০১ এর ৫০ ধারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করে।

**সালিশি প্রক্রিয়া (Arbitration):** নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বিরোধের কারণ উদ্ভব হওয়ার পরবর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তিকে ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে বিরোধ দাখিল করতে হয়। উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিবন্ধক বিধি সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা একজন 'সালিশকারী' নিয়োগ করেন। সালিশকারী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করে রায় প্রদান করবেন। সালিশকারী বিরোধ মামলা গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করেন তবে সুনির্দিষ্ট কারণে নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা না গেলে নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত ৬০ দিন সময় পেয়ে থাকেন।

**আপিল এবং জেলা জজ আদালত:** সালিশকারীর রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে আইনের ৫২ ধারা অনুযায়ী জেলা জজ আদালতে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। তবে জেলা জজ কেবলমাত্র 'আইনগত জটিল প্রশ্ন' বা 'ন্যায়বিচারের চরম অবমাননা' ঘটলে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। ধারা ৫১ অনুযায়ী, সালিশি রায় বা আদেশ দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির মতো কার্যকর হয়।

**উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও রিট এখতিয়ার:** বাংলাদেশের উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট বিভাগ) সাধারণত সমবায় নির্বাচনি বিরোধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চায় না যতক্ষণ না আইনের নির্ধারিত সকল প্রশাসনিক পথ (যেমন সালিশি মামলা) শেষ হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে যে, সমবায় আইনের ৫০ ধারা একটি কার্যকর বিকল্প প্রতিকার ব্যবস্থা, তাই সরাসরি রিট মামলা রক্ষণীয় নয়। তবে যদি নির্বাচন কমিটি বা নিবন্ধক আইন বহির্ভূতভাবে বা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তবে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট আবেদন করা সম্ভব।

## আইনি জটিলতা দেখা দিলে সদস্যদের করণীয়

নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম বা জটিলতা দেখা দিলে সদস্যদের জন্য করণীয় পদক্ষেপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. **দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহ**

যেকোনো আইনি পদক্ষেপের প্রথম শর্ত হলো প্রমাণ। সদস্য বই, শেয়ার সার্টিফিকেট, ভর্তি ফি জমা দেওয়ার রসিদ এবং খসড়া ভোটার তালিকার অনুলিপি সংগ্রহ করতে হবে।

২. **সঠিক সময়ে আপত্তি দাখিল**

তফসিলের প্রতিটি পর্যায়ে নির্ধারিত সময়সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোনয়নপত্র বাতিল হলে বা ভোটার তালিকায় ভুল থাকলে তফসিলে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেই আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

৩. **সালিশি মামলা দায়ের (Dispute Case)**

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর অনিয়ম

ধরা পড়লে দেরি না করে ৩০ দিনের মধ্যে সালিশি মামলা করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ১০০ টাকার কোর্ট ফি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

## সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিদ্যমান প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমবায় খাত নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন। বিশেষ করে নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব সমবায় আন্দোলনের মূল লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে।

১. **আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ**
সমবায় আইন ২০০১-এর ৪ ধারা সরকারকে যেকোনো সমিতিকে আইনের সকল বা যেকোনো বিধান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ অনেক সময় সমিতির স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করা হয়।

২. **রাজনৈতিক প্রভাব ও 'ভোট ব্যাংক' রাজনীতি**
সমবায় সমিতিগুলো অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অনেক সময় প্রকৃত সমবায়ীদের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সমিতির নেতৃত্ব দখল করে নেয়, যা সমবায়ের আদর্শের পরিপন্থি।

৩. **আর্থিক অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ**
বিগত কয়েক বছরে সমবায় খাতে ব্যাপক আর্থিক কেলেঙ্কারি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ধরনের অনিয়মের মূলে রয়েছে স্বচ্ছ নির্বাচনের অভাব এবং একই চক্রের বছরের পর বছর ক্ষমতায় থাকা। যখন নির্বাচন যথাযথভাবে হয় না, তখন জবাবদিহিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৪. **ভোটার তালিকায় কারচুপি ও জালিয়াতি**
ভোটের পূর্বে ভোটার তালিকা প্রণয়নে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যায়। মৃত সদস্যদের নাম তালিকায় রাখা, অ-সদস্যদের ভোটার করা বা প্রকৃত সদস্যদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মতো ঘটনা সমবায় নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

## সমবায় খাতের সুশাসনে কাঠামোগত সংস্কারের প্রস্তাবনা

সমবায় আন্দোলনকে তৃণমূলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমূল আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার অ্যাজেন্ডার সাথে সংগতি রেখে সমবায় খাতের জন্য নিম্নোক্ত সংস্কারের সুপারিশসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

**সমবায় আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা;**

**সমবায় আইনের ধারা ৪-এর সংশোধন:** সরকারের অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতাকে অত্যন্ত সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ জাতীয় সংকট) ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা;

**অনলাইন ভোটার ডাটাবেজ:** সকল সমবায় সমিতির সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যাতে ভোটার তালিকায় জালিয়াতি রোধ করা যায়;

**ই-ভোটিং এবং সিসিটিভি:** বড় আকারের সমবায় এবং কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতিগুলোর নির্বাচনে ই-ভোটিং প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;

**স্বাধীন অডিট উইং:** সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী অডিট উইং প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

**বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) বাধ্যতামূলককরণ:** নির্ধারিত সময়ে এজিএম না করলে বর্তমান কমিটির সদস্যপদ বাতিলের বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

**নারী ও যুব কোটা:** সমবায় আন্দোলনে নারী এবং যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্দিষ্ট শতাংশ কোটা সংরক্ষণ বা বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা;

**পেশাদার প্রশিক্ষণ:** সমবায়ীদের জন্য আধুনিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের ওপর সমবায় একাডেমি ও জোনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

## উপসংহার

একটি বৈষম্যহীন সমবায় ব্যবস্থার পথে সমবায় সমিতি কেবল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। এটি প্রান্তিক মানুষকে মর্যাদা এবং আত্মনির্ভরশীলতার পথ দেখায় তবে

**একটি বৈষম্যহীন সমবায় ব্যবস্থার পথে সমবায় সমিতি কেবল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। এটি প্রান্তিক মানুষকে মর্যাদা এবং আত্মনির্ভরশীলতার পথ দেখায় তবে বাংলাদেশে সমবায় খাতের বর্তমান সংকট অত্যন্ত গভীর।**

বাংলাদেশে সমবায় খাতের বর্তমান সংকট অত্যন্ত গভীর। দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং নেতৃত্বের সংকটে সমবায় তার পথ হারিয়েছে। একটি সমৃদ্ধ, দারিদ্র্যমুক্ত এবং বৈষম্যহীন 'নতুন বাংলাদেশ' গড়তে সমবায় আন্দোলন হতে পারে প্রধান চালিকাশক্তি। এর জন্য প্রয়োজন সমবায় আইন ২০০১ এবং বিধিমালা ২০০৪-এর বিদ্যমান কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন, বিশেষ করে নির্বাচন পদ্ধতিকে আধুনিক ও প্রভাবমুক্ত করা এবং আর্থিক তদারকিকে শক্তিশালী করা অর্থাৎ স্বচ্ছ নির্বাচনি ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচারিক কাঠামো এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত সংহতি। সরকারের দৃঢ় সদিচ্ছা এবং সমবায়ীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পারে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে বিশ্বজুড়ে একটি রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমবায়ের এই রূপান্তর কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি সামাজিক বিপ্লব যা গ্রামীণ ও শহরতলির মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম। একটি সফল ও প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি কেবল তখনই সম্ভব যখন এর নেতৃত্বে থাকবেন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, যারা কেবল সমিতির লাভের দিকেই নজর দেবেন না, বরং সাধারণ সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক জীবনমানের উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকবেন। নির্বাচনের এই গণতান্ত্রিক চর্চাই পারবে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে বিশ্বের দরবারে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে।

**জেবুন নাহার:** অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা)

# লাভজনক ফসল উৎপাদনে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সফলতা

মোঃ সহিদুল হক, মোঃ নুরুল আনোয়ার ও ড. কিউ আর ইসলাম

এক যুগেরও বেশি আগে ২০১২ সালে বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু। প্রায় সাড়ে আঠার শত একর জুড়ে অবস্থিত বংশধর, জামুর, বেলঘড়িয়া ও কাশিপাড়া সহ এগারোটি গ্রামে আবাদি জমিতে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও নিমজ্জনে আমন ধান এবং শুষ্ক মৌসুমে খরাতে বোরো ধান, আলু ও অন্যান্য রবি ফসল নষ্ট হয়ে যেত। কৃষকদের এই ভোগান্তি থেকে রেহাই পেতে কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর শেরপুর উপজেলা কার্যালয়ে বর্ষা মৌসুমে বন্যাপানি নিষ্কাশন ও শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করে ফসল রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে একটি প্রস্তাব পাঠায়। উপজেলা প্রকৌশলী প্রস্তাবটি সরেজমিনে পরীক্ষা করে শেরপুর উপজেলা পরিষদের সভায় উত্থাপন করে। সভার সদস্যরা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে এলজিইডিকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মতি প্রদান করে। বগুড়া জেলার এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে ঢাকায় সদর দপ্তরে অবস্থিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে প্রেরণ করে। প্রস্তাবটি যথাযথভাবে

পরীক্ষা করে এলজিইডি কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পকে দায়িত্ব দেয়। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও এগারো গ্রামের ভুক্তভোগী কৃষকদের সমস্যার ভিত্তিতে প্রকল্প থেকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় আকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে একটি উপপ্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা ও ডিজাইন বা নক্সা প্রনয়ণ করা হয়। এতে ভুক্তভোগীদের সম্মতিক্রমে উচলবাড়ী থেকে বংশধর পর্যন্ত ভদ্রাবতী নদী নামে পরিচিত ভদ্রাবতী-তিলকাতলা খাল পুনঃখনন এবং এই খালের উপর পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এলজিইডি দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯৯৫ সাল থেকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সনাক্ত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পে সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ এবং ভূপরিস্থ পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে। জাতীয় পানি নীতিতে সকল প্রকারের পানি উন্নয়ন প্রকল্পে উপকারভোগীসহ স্থানীয় সকল অংশীজন (স্টেকহোল্ডারস) উপপ্রকল্প সনাক্ত, প্রস্তাবনা, বাস্তবায়ন এবং নির্মিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপপ্রকল্প প্রণয়নেও সকল স্থানীয় জনগণ বিশেষ ভাবে উপকারভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। উপপ্রকল্প বাছাই, পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি উপপ্রকল্পে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য উপকারভোগী ও অংশীজনসহ স্থানীয় জনগণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করে। সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হওয়ার পরে অধিকাংশ খানা বা পরিবার থেকে পাবসস সদস্যভুক্তি বৃদ্ধি পায়। উপপ্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত উপপ্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা চূড়ান্তকরণের পর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। উপপ্রকল্প এলাকায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের মধ্যে বাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও সেচ নালা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার এবং খাল পুনঃখনন বা খনন অন্যতম। নির্মিত অবকাঠামোর টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ভদ্রাবতী তিলকাতলা উপপ্রকল্প এলাকায় বসবাসরত সবার সম্মতিক্রমে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভদ্রাবতী-তিলকাতলা খাল পুঃখনন এবং পানি সংরক্ষণের জন্য খালের উপর একটি কাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। নির্মিত আকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য পানি নিষ্কাশনের অভাবে আবাদি জমি জলাবদ্ধ, নিমজ্জন ও খরা কবলিত গ্রামে বসবাসকারী জনগণ ২০১২ সালে পাবসস সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে। সাংগঠনিক কমিটির মেয়াদ ৩ মাস পূর্তির আগেই প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২০১৩ সালে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পানি ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতি লিঃ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়। উপপ্রকল্প এলাকায় প্রায় পনের শত একর বিস্তৃত আবাদি জমিতে জলাবদ্ধতা, নিমজ্জন ও খরা নিরসণে উপকারভোগীদের অধিকাংশই পাবসস সদস্যভুক্ত হয়। মোট সদস্যদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা দুই-পঞ্চমাংশ অতিক্রম করে। সদস্যদের শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় আমানত বাবদ অর্থের মাধ্যমে পাবসস মূলধন গঠন করা হয়। পাবসস অফিসে হিসাবরক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। সমবায় আইন মোতাবেক হিসাব রেজিস্টার ও রেকর্ডসমূহ সংরক্ষিত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। পাবসস মাসিক সভা ও সাধারণ সদস্যদের সাপ্তাহিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত স্থানে পাবসস অস্থায়ীভাবে নিজস্ব কার্যালয় বা অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীতে এলজিইডি প্রকল্প ব্যয়ে স্থায়ী অফিস ঘর নির্মাণ করে দেয়। নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পাবসস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের পর একটি তহবিল গঠন করা হয়। এলজিইডি জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী ও পাবসস সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে এই অর্থ জমা প্রদান করা হয়। উপপ্রকল্প এলাকায় যাবতীয় আবকাঠামোর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলো এলজিইডি ২০১৭ সালে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর এর মাধ্যমে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করে। চুক্তিপত্রে এলজিইডি প্রথম পক্ষ, পাবসস এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দ্বিতীয় পক্ষ এবং কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৃতীয় পক্ষ হিসেবে হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। উপপ্রকল্প গ্রহণের ফলে জলাবদ্ধতা ও নিমজ্জন থেকে আমন ফসল রক্ষা পায়। সেচে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় গোলআলু আবাদি জমি খরামুক্ত হয়।

উপপ্রকল্প গ্রহণের ফলে এগারো গ্রামের ১,০৫০ খানা বা পরিবার উপকৃত হয়েছে। উপকারভোগী খানাসমূহ থেকে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পাবসস এর সদস্যা সংখ্যা ৬১০ জন, এর মধ্যে নারী সদস্য সংখ্যা ৩০৬ জন। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বশেষ নির্বাচন ও সমিতির অডিট সম্পন্ন হয়েছে যথাক্রমে

*ভদ্রাবতী-তিলকাতলা খালের উপর নির্মিত পানি সংরক্ষণ কাঠামো।*

*ভদ্রাবতী তিলকাতলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়।*

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর ও ২০২৫ সালের জুলাই মাসে। সদস্যদের ৬৮,৬৬,০৬৫ টাকা সঞ্চয় ও ১২,০১,৪০০ টাকা শেয়ার বিক্রির অর্থসহ সমিতির মোট তহবিলের পরিমাণ ৮০,৬৭,৪৬৫ টাকা। এছাড়া নির্মিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বাবদ ব্যাংকে ৫,৯০,০০০ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা আছে। এছাড়াও ৩৩,০০০ টাকা জমা আছে নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ। সমিতির সদস্যদের মধ্যে শুরু থেকে এপর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৫০,৮৫,৫০০ টাকা। ঋণ নিয়মিত পরিশোধ করায় ঋণখেলাপির সংখ্যা শুন্য। উল্লেখ্য পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

উপপ্রকল্পে পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, টেকসই কৃষি উৎপাদন, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, জেন্ডার উন্নয়ন, আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে পবসস সাধারণ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এলজিইডি প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় সদস্যদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ৮ জন মহিলা সহ ২০ জন কৃষক সদস্য বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে জলবায়ু সহিষ্ণু জাতের উচ্চ মানসম্মত বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর বিশেষজ্ঞগণ প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ দিয়েছে। এলজিইডি'র জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহায়তায় পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা থেকে ব্রিধান ৮৮ জাতের বোরো ধানের ভিত্তি বীজ ক্রয় করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতি সদস্যকে তিন কেজি হারে প্রদান করেছে। এই বীজ থেকে ফসল উৎপাদন করে বেশি ফলন পেয়ে তারা লাভবান হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য কৃষকেরা আগ্রহী হয়ে বীজ সংগ্রহ করে উপপ্রকল্পে বোরো ধানের উৎপাদন করে খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ভদ্রাবতী তিলকাতলা পাবসস এর অন্যতম কৃতিত্ব হলো উৎপাদিত ফসল অধিকতর লাভজনক মূল্যে বিক্রয়ে সহায়তা দিয়ে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা। কৃষকেরা সাধারণত ফসল কর্তনের পরপরই বিক্রয় করে থাকে। এতে প্রত্যাশিত মূল্য থেকে কমে ফসল বিক্রয়ে কৃষকেরা বঞ্চিত হয়। ফসল উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়ে। কৃষকদের এই ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে ভদ্রাবতী তিলকাতলা পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। উপপ্রকল্প এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কর্তনের পর স্থানীয় ছোট থেকে বড় এমনকি উপজেলা পর্যায়ে ভান্ডার বা গুদাম ভাড়া নিয়ে সাময়িকভাবে মজুত করা হয়। কৃষকেরা প্রয়োজন হলো পাবসস থেকে ফসলের বিপরীতে অগ্রীম অর্থ নেয়ার বা বিক্রয় করে দেয়ার সুযোগ থাকে। পাবসস নিজস্ব তহবিল থেকে এই অর্থ প্রদান করে। পরবর্তীতে উঠতি মূল্যে সদস্যদের সম্মতিক্রমে ফসল বিক্রয় করে দেয়া হয়। এই ভাবে প্রতি মন ফসল বিক্রয় করে ভান্ডার বা গুদাম ভাড়া ও পরিবহন খরচ মিটিয়ে দুই থেকে তিনশত টাকা পর্যন্ত বাড়তি লাভ অর্জিত হয়। লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা দেয়া হয়। পাবসস ব্যবস্থাপনায় ফসল বিক্রয়ে উপপ্রকল্প এলাকার কৃষকেরা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে।

অধিকতর সেচ সুবিধা প্রদান ও দ্রুত পানি নিষ্কাশনে উপপ্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়ধীন জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পবসস থেকে প্রাপ্ত উপপ্রকল্প এলাকাধীন চারটি শাখা খাল পুনঃখনন ও ভদ্রাবতী খালের উপরে আরও একটি পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যথার্থতা, যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লিখিত শাখা খালসমূহ পুনঃখনন ও অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্ত হলো উপপ্রকল্পে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা ও সুযোগ অধিকতর হবে। বন্যা ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশনের উন্নতি এবং পানি সংরক্ষণে পুকুর, খাল ও বিলসহ বিভিন্ন জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উপপ্রকল্পে কৃষি ব্যবসা বা এগ্রিবিজনেস উন্নয়ন ও কৃষিপণ্য বিপণনের সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্প থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং খামার বা গ্রামীণ ছোট রাস্তা উন্নীত করার বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। অতিরিক্ত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, কৃষি ব্যবসা ও বিপণন সুবিধার প্রসার, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি এবং পাবসস সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান ভদ্রাবতি তিলকাতল উপপ্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনে ও অসহায় ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক হবে। উপপ্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

**মোঃ সহিদুল হক, আনোয়ার হোসেন ও ড. কাজী রেজাউল ইসলাম**: বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন সাপোর্ট কনসালট্যান্ট টিমে যথাক্রমে পানি সম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ/ডেপুটি টিম লিডার, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র এ্যাগ্রনমিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

# জুলাই আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

খ. ম. রেজাউল করিম

যুগ যুগ ধরে নারীরা যে অত্যাচার-অবহেলা সয়ে এসেছে খেলার পুতুল হয়ে, তাকে দূর করতে কেবল দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখেই নয়—এর প্রতিকার হবে বিদ্রোহে (সুফিয়া কামাল, ২৩ জুলাই, ১৯২৯)।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মাইলফলক। পহেলা জুলাই ২০২৪ এ আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে এটি ছিল কোটা সংস্কার ও পরবর্তীকালে তা সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। জুলাই আন্দোলন বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার নজির একাত্তরের পরে আর দ্বিতীয়টি নেই। এদেশে পর পর যেসব আন্দোলন হয়েছে, তার মধ্যে জুলাই আন্দোলন সব থেকে ব্যাপক, গভীর এবং শাসকদের বিরুদ্ধে অধিক আক্রমণাত্মক। এ আন্দোলনের একটি প্রধান ভিত্তি ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এবং সমতাসম্পন্ন সমাজ গঠন। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের যেমন প্রভাব পড়েছে, গণমানুষের মনোজগতে, চিন্তা ও সৃজনশীলতায় তেমনই গভীর অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

যেকোনো আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ এক বড় শক্তি। আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ যত বেশি থাকে, সেটি আলাদা শক্তি প্রদর্শন করে। বাংলাদেশের আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ছিল বরাবরের মতোই অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন; সবকিছুতে নারীরা ছিল সম্মুখ সারিতে। জানা যায়, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনে দেশের অর্ধেকের বেশি জনশক্তি নারীরা পুরুষের পাশাপাশি রাজপথে অংশ নিয়ে নানাভাবে এ আন্দোলনকে জোরদার করেছে। তারা নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে আন্দোলনের শুরু থেকেই

ছাত্র-জনতার সঙ্গে ছিলেন। বাংলাদেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা থাকলেও, জুলাই আন্দোলনের মতো এত বিপুল সংখ্যক নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতোপূর্বে কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, ‘আন্দোলনের সময় নারীকে মিছিলের সামনে রাখা হতো যেন পুলিশ সরাসরি আক্রমণ না করে।’ অর্থাৎ নারীকে আন্দোলনের ভ্যানগার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অনেক কৌশল অবলম্বন করে, বাড়িতে মিথ্যা বলে, কোচিংয়ের কথা বলে, বাবা-মায়ের পা ধরে, সামাজিক ঘেরাটোপ ভেঙে নারীরা এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। একদিকে যেমন নারীরা মাঠে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সুসংগঠিত করেছেন শিক্ষার্থীদের; তেমনি চিকিৎসক-নার্সরা আহত ছাত্র-জনতাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন, কর্মজীবী ও গৃহিণী মা বোনেরা রাস্তায় পানি খাইয়েছেন। নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ জুলাই আন্দোলনকে যেমন বেগবান করেছে, তেমনি সফলতার শিখরে পৌঁছাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

নারীদের অংশগ্রহণ জুলাই আন্দোলনকে পূর্ণতা দিয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নারী একটা বড় শক্তির জায়গা। আন্দোলন যখন শান্তিপূর্ণভাবে বিকশিত হচ্ছিল, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজ, এমনকি স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রীরাও রাস্তায় নেমে এসেছে। এরপর যখন আক্রমণ শুরু হয়, তখন প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে মেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে বেরিয়ে এসেছিল ১৪ জুলাই, ২০২৪ রাতে। এছাড়া সন্তানের পাশে মায়েরা রাজপথে যেমন স্লোগানে-মিছিলে থেকেছেন, তেমনি কোনো কোনো নারী খাবার, আশ্রয়, চিকিৎসা, অর্থ সাহায্য, মানসিক সাহস ও শক্তি দিয়ে পাশে থেকেছেন। শহর থেকে গ্রাম, দেশ থেকে বিদেশে, ধনি থেকে দরিদ্র, নানান ধর্ম-বর্ণের, নানান জাতিসত্তার, সর্বস্তরের বিভিন্ন শ্রেণি পেশা পরিচয়ের নারীরা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। সমাজের অন্য সবার মতোই নারীদের এই সাহসী, নির্ভীক ভূমিকা ছাড়া স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

জুলাই আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক ছিল বিভিন্ন ধর্ম, মতের কিংবা বিভিন্ন পোশাকে নারীর অংশগ্রহণ। এই নারীদের কারো পরনে ছিল কালো বোরকা, কারো কপালে ছিল লালটিপ, কারো হিজাব, কারো শাড়ি, কারো বা জিন্স-টিশার্ট ছিল। আবার কারো বা সাদা জোব্বা ছিল। এই আন্দোলনের একটি বড় অংশ মায়েরা, যারা সন্তানের হাত ধরে নেমে এসেছিলেন রাস্তায়। অনেক ভিডিওতে দেখা গেছে, পুলিশের সঙ্গে নারীরা তর্ক করছেন। তর্কের যুক্তিগুলোও খুব শক্তিশালী। শুধু তারা মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন বিষয়টা এমন নয়, শক্তিশালী যুক্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। অর্থাৎ আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তেই নারীদের

**জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীরা শুধু অংশগ্রহণকারী ছিল না, তাঁরা ছিল মূল চালিকাশক্তি। চলতি দশকে কোনো আন্দোলনে রাজপথে নারীদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখা যায়নি।**

প্রতিবাদী অংশগ্রহণ ছিল অনুপ্রেরণার-উদ্দীপনার। কিছুক্ষেত্রে তারা ছাত্রদের থেকেও সাহসী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে তাদের কণ্ঠে গগনবিদারী স্লোগান রাজপথে আন্দোলনরত সহযোদ্ধাদের চাঙ্গা রেখেছিল। তাই যারা নারীকণ্ঠকে দমিয়ে রাখতে চায় তাদেরকে থোরাই কেয়ার করে গ্রাফিতির লিখন ‘চিৎকার কর মেয়ে দেখি যতদূর গলা যায়’ নারী শক্তিকে উজ্জীবিত করেছিল। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে অহিংস আন্দোলনের বিপরীতে সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করলে নারী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের প্রতি সংহতি

## জুলাই আন্দোলনে নিহত নারীদের তথ্য

| ক্রমিক | নাম | বয়স | পেশা | জেলা | মৃত্যু |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোসাম্মত লিজা | ১৮ বছর | গৃহকর্মী ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী | ভোলা | ১৮ জুলাই, ২০২৪ |
| ২ | নাসিমা আক্তার | ২৪ বছর | ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে | নোয়াখালী | ১৯ জুলাই, ২০২৪ |
| ৩ | রিয়া গোপ | ৬ বছর | নার্সারি শ্রেণির ছাত্রী | নারায়ণগঞ্জ | ১৯ জুলাই, ২০২৪ |
| ৪ | নাঈমা সুলতানা | ১৪ বছর | ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী | চাঁদপুর | ১৯ জুলাই, ২০২৪ |
| ৫ | মায়া ইসলাম | ৬০ বছর | ব্যবসায়ী | টাঙ্গাইল | ২০ জুলাই, ২০২৪ |
| ৬ | সুমাইয়া আক্তার | ২০ বছর | গৃহিনী | বরিশাল | ২০ জুলাই, ২০২৪ |
| ৭ | মেহেরুন নেছা তানহা | ২২ বছর | অনার্স ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী | মানিকগঞ্জ | ৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| ৮ | রিতা আক্তার | ১৭ বছর | একাদশ শ্রেণির ছাত্রী | জয়পুরহাট | ৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| ৯ | নাফিসা হোসেন মারওয়া | ১৭ বছর | একাদশ শ্রেণির ছাত্রী | গাজীপুর | ৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| ১০ | শাহীনুর বেগম | ৫৭ বছর | মাছ ব্যবসায়ী | কুমিল্লা | ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |

সূত্র: দি ডেইলি স্টার বাংলা, ৮ মার্চ ২০২৫, দৈনিক প্রথমআলো, ১৩ জুলাই, ২০২৫

জানিয়ে পোশাককর্মী, গৃহিণী, মা, চিকিৎসক, নার্সসহ সব পেশাজীবী নারী রাস্তায় এক কাতারে সমবেত হন। স্বৈরাচারের পতন পর্যন্ত তারা আন্দোলনে রাজপথ ও অনলাইনে সক্রিয় ছিলেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট অনুযায়ী, এ আন্দোলনে কমপক্ষে ১৩ জন নারীসহ ১,৪০০ জন ছাত্র-জনতার প্রাণ বিসর্জন ঘটে। এর মধ্যে ১১৮ জন শিশু ছিল। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার্থী, নারী, শিশু, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ রয়েছে। নিহত শিশুদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত শিশুরাও ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ ঘটনাস্থলে, আবার কেউ চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে হাসপাতালে মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত সরকার মোট ৮৪৪ জন শহিদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী ১০ জন নারীর নাম রয়েছে। তবে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৩২ শিশু-কিশোর এবং ১১ জন নারী শহিদ হয়েছেন। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার ভাষায় জুলাই অভ্যুত্থানে ১১ জন নারী শহিদ হয়েছেন (প্রথমআলো, ৯ মার্চ ২০২৫)। এদের মধ্যে রয়েছেন মায়া ইসলাম, মেহেরুন নেছা তানহা, মোসাম্মত লিজা, রিতা আক্তার, নাফিসা হোসেন মারওয়া, নাসিমা আক্তার, রিয়া গোপ, শাহীনুর বেগম, সুমাইয়া আক্তার, মোসা. আক্তার ও নাঈমা সুলতানা। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন শিক্ষার্থী, দুজন কর্মজীবী, দুজন গৃহবধূ। একজন শিক্ষা বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাজে ছিলেন না। এদের মধ্যে ৪ জনের বয়স ১৮ বছরের নিচে। শহিদ ১০ জন নারীর মধ্যে ৭ জন ঢাকায়, ২ জন নারায়ণগঞ্জে ও ১ জন সাভারে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তথ্যানুযায়ী তাঁদের মধ্যে ৭ জনই গুলিবিদ্ধ হন নিজ বাসার বারান্দা ও ছাদে। ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন সড়কে।

উপরের সারণিতে দেখা যায়, নারী আন্দোলনকারীদের মধ্যে ১৮ জুলাই ১ জন, ১৯ জুলাই ৩ জন, ২০ জুলাই ২ জন, ৫ আগস্ট ৩ জন এবং ১ সেপ্টেম্বর ১ জন শহীদ হন। জানা যায়, প্রথম গুলিবিদ্ধ হন গৃহকর্মী লিজা আক্তার। ঘটনার তিন দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম মৃত্যু শিক্ষার্থী নাঈমা ১৯ জুলাই, ২০২৪। একই দিন গুলিবিদ্ধ হন মায়া ইসলাম, রিয়া গোপ, নাছিমা আক্তার। ৫ আগস্ট, ২০২৪ সন্ধ্যায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান মেহেরুন নেছা। একই দিন দুপুরে ও বিকেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় আরও দুই শিক্ষার্থীর রিতা আক্তার ও নাফিসা হোসেন মারওয়া। সর্বশেষ মৃত্যু শাহিনুর বেগমের। তিনি ২২ জুলাই, ২০২৪ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২৫)।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হকের ভাষায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের সাহসী ভূমিকা ছিল। গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শক্তি ছিলেন নারীরা। আন্দোলনে ব্যাপকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ সবাইকে উদ্দীপ্ত করেছে, শক্তি জুগিয়েছে। তাই আন্দোলনকারী নারীদের ভূমিকা অস্বীকার করা অর্থ তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাকে খাটো করা। এই বঞ্চনা তাদের সামাজিক, মানসিক ও পেশাগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সংগত কারণে জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারী শহিদদের, পুরুষ শহিদদের মতো সমান গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার। নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের জন্য নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করার মতো পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারিভাবে আহত নারীদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সম্মান জানানোর কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে ১ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৩৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচি পালন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। জুলাই স্মৃতি উদযাপন অনুষ্ঠানমালায় ১৪ জুলাই 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম' স্লোগানে দেশজুড়ে পালন করা হয়েছে 'জুলাই উইমেন্স ডে।'

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীরা শুধু অংশগ্রহণকারী ছিল না, তাঁরা ছিল মূল চালিকাশক্তি। চলতি দশকে কোনো আন্দোলনে রাজপথে নারীদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখা যায়নি। মাঠে উপস্থিত থাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কলাকৌশল সমন্বয়সহ সবখানে অবদান রেখেছেন নারীরা। জুলাই আন্দোলনে নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন পথ চলার সাহস ও প্রেরণা জোগাবে।

**খ. ম. রেজাউল করিম:** অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান) ও অতিরিক্ত পরিচালক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনা।)

# হিমালয় থেকে আন্তর্জাতিক টেবিলে ইলাম নেপালের চায়ের গল্প

সাইয়্যেদাতুন নেছা

পাহাড়ের বুক জুড়ে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, আর সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্তহীন সবুজ। এ যেন প্রকৃতির নিজ হাতে আঁকা জলরঙের ক্যানভাস। নেপালের পূর্বাঞ্চলের ইলাম জেলা যাকে অনেকেই "নেপালের চা রাজধানী" বলে দেশটির ৯০ শতাংশেরও বেশি চা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পাহাড়ি অঞ্চলে চা চাষের ইতিহাসও কম পুরোনো নয়। ১৮৬৩ সালে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় নেপালের প্রথম চা বাগান। নেপালের পূর্বাঞ্চলের এই শান্ত পার্বত্য শহরটি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, বিশ্বমানের অর্থোডক্স (Orthodox) চায়ের জন্যও বিখ্যাত। অর্থোডক্স চা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯০০ থেকে ২,১০০ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, হাতে তোলা হয় এবং এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়া, কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এবং উর্বর মাটি চা পাতাকে ধীরে বাড়তে সাহায্য করে যার ফলে তৈরি হয় অনন্য সুবাস ও স্বাদযুক্ত চা। এই চা তার বিশেষ সুবাস ও স্বাদের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্য পায়। ১৫৭ বছর পর দেশটির অর্থোডক্স চা "Nepal Tea Quality from the Himalaya" নামে নিজস্ব ট্রেডমার্ক পেয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাজারে নেপাল চা কে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডে পরিণত করেছে। চা আজ ইলামের সবচেয়ে বড় শিল্প এবং এখানকার বিস্তীর্ণ জমি চা গাছে আচ্ছাদিত। বর্তমানে নেপালে ১৫,০০০ এরও বেশি ক্ষুদ্র কৃষক চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং বার্ষিক উৎপাদন ২৬,০০০ মেট্রিক টনের বেশি। এর মধ্যে একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধানত ভারত, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নেপাল থেকে প্রায় ১৬.৫০ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৩.৬৩ বিলিয়ন নেপালি রুপি । এখানে চা শুধু ফসল নয় এটি সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু। তবে শুরুর দিকে চা চাষ কিন্তু এই কৃষকদের প্রথম পছন্দ ছিল না। একসময়

তারা বড় এলাচ, আলু ও বিভিন্ন সবজি চাষ করতেন। কিন্তু কম উৎপাদন এবং কম আয়ের কারণে জীবিকা ছিল অনিশ্চিত। তখনই তারা বুঝতে পারেন চা একটি টেকসই নগদ ফসল। প্রথম দিকে স্থানীয় কারখানায় সবুজ পাতা বিক্রি করলেও দেরিতে টাকা পাওয়া এবং দুর্বল দর-কষাকষির ক্ষমতা তাদের সমস্যায় ফেলত। এই চ্যালেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসার পথ ছিল একটাই-সমবায়। সদস্য সমবায়গুলো একটি বিকল্প উন্নয়ন মডেল উপস্থাপন করে, যেখানে চা একটি পণ্য হলেও উন্নয়নের মূল লক্ষ্য মানুষ, ন্যায্যতা ও সহযোগিতা।

নেপালের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (NPO) এর উদ্যোগে 'Multicountry Observational Study Mission on Productivity Gainsharing in Agriculture শীর্ষক প্রজেক্টের অধীনে বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশের প্রতিনিধিদের মাল্টি-কান্ট্রি গেইন শেয়ারিং' এর অংশ হিসেবে নেপালের ইলাম জেলার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে দুধ ও চা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলশ্রুতিতে নেপালের ইলাম অঞ্চলে কিভাবে সমবায়ভিত্তিক চা শিল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এ প্রবন্ধ লেখকের কাছ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। এ প্রবন্ধে ইলামের চা শিল্পের সাফল্য এবং বাংলাদেশের জন্য এ খাতে সম্ভাবনা নিয়ে একটি ধারণা দেয়া হলো।

## ইলামের সমবায়ভিত্তিক চা শিল্প

হিমালয়ের কোল ঘেঁষা নেপালের পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য জেলা ইলামকে অনেকেই নেপালের "গ্রিন জুয়েল" বা সবুজ রত্ন বলে থাকেন। এখানে শুধু চা নয়; কার্ডামম, আদা, আলু ও দুগ্ধজাত পণ্যও উৎপাদিত হয়, কিন্তু চা-ই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। এখানে সমবায়ের মাধ্যমে মূলত উচ্চমানের অর্থোডক্স চা উৎপাদন করা হয়, যা হাতে তৈরি এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। ক্ষুদ্র চাষিরা সমবায়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা, ন্যায্যমূল্য এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা পেয়ে থাকেন। এই চা বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য পরিচিত এবং এর বড় অংশ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হয়।

## সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত নেপালি চায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য

**চা প্রক্রিয়াকরণ:** কাঁচা পাতা থেকে গ্লাস পর্যন্ত চা তৈরি একটি শিল্প, আবার বিজ্ঞানও। অর্থোডক্স চায়ের উৎপাদন সাধারণত ১৫০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় হয়। বেশিরভাগ সমবায় সমিতি তার সদস্য ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে সবুজ চা পাতা সংগ্রহ করে এবং সেগুলোকে অর্থোডক্স পদ্ধতিতে (উইদারিং, রোলিং, অক্সিডেশন ও ড্রাইং) প্রক্রিয়াজাত করে। এই চা সাধারণত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত এবং গুণমানসম্পন্ন। অর্থোডক্স চা ছাড়াও সমবায়গুলো গ্রিন টি, হোয়াইট টি এবং ওলং টি-এর মতো বিশেষ চা (Specialty teas) উৎপাদন করে। এই চা শিল্পে গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে এবং এটি স্থানীয়দের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মাল্টিকান্ট্রি গেইন শেয়ারিং স্টাডি মিশনে আমরা বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশের প্রতিনিধিগণ নিম্নে বর্ণিত ২টি রপ্তানিমুখী সমবায়ভিত্তিক চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন করি।

## উচ্চ পাহাড়ি চা উৎপাদক সমবায় সমিতি লিমিটেড

২০০১ সালের ২৫ মার্চ ৩৩ জন সদস্য নিয়ে উচ্চ পাহাড়ি চা উৎপাদক সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই কো-অপারেটিভে ৩৩ জন নারীসহ ১৭২ জন সমবায়ী কৃষক মিলেমিশে চা উৎপাদন করছে। "উচ্চ পাহাড়ি" একটি নেপালি শব্দ, যার অর্থ "উঁচু পাহাড়"। এই সমবায়ের চা বাগানসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৭০০ থেকে ২,৩০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে চা পাতা কেটে বিক্রি করার মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও 'চা ভ্যালু চেইনে' কৃষকদের অবস্থান আরও শক্ত করতে ২০১৮ সালে স্থাপন করা হয় সমিতির নিজস্ব চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা। এই উদ্যোগ কৃষকদের শুধু উৎপাদক নয় ধীরে ধীরে উদ্যোক্তায় রূপান্তর করেছে। আজ উচ্চ পাহাড়ি সমবায় সমিতির চা দেশীয় বাজার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও পৌঁছাচ্ছে।

ভোরের আলো তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ইলাম জেলার পাহাড়ি ঢালে। কুয়াশার চাদর সরিয়ে যখন সূর্যের প্রথম রশ্মি চা বাগানের ওপর পড়ে, মনে হয় যেন সবুজের ওপর সোনালি রঙের তুলির আঁচড়। দেউমাই পৌরসভার পাহাড়ি পথ ধরে উচ্চ পাহাড়ি সমবায় সমিতির চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পৌঁছালে প্রথমেই চোখে পড়ে কর্মব্যস্ততা। তাদের চা বাগান বিস্তৃত প্রায় ৮৬.৪ হেক্টর অর্গানিক সার্টিফায়েড জমিতে। ইলামের উচ্চ ভূমিতে গড়া এই চায়ের বাগানগুলোতে বছরে প্রায় ৩০০ মেট্রিক টন সবুজ চা পাতা উৎপাদিত হয়। এর অর্ধেক নিজস্ব কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়, আর বাকিটা অন্য অর্গানিক কারখানায় পাঠানো হয়। কারখানাটির বার্ষিক সক্ষমতা প্রায় ৩০ মেট্রিক টন, যেখানে তৈরি হয় অর্থোডক্স ব্ল্যাক টি, অর্থোডক্স গ্রিন টি, বিশেষ চা-হোয়াইট টি (সিলভার নিডল) ও গোল্ডেন টি (গোল্ডেন নিডল)। কারখানার ভেতরে ঢুকলে চায়ের গন্ধ যেন বাতাসে ভাসে। এখানে চা শুধু পানীয় নয়, এটি মানুষের সম্মিলিত শ্রমের ফল। প্রতিটি পাতা সংগ্রহের পেছনে আছে সমবায়ভিত্তিক সম্মিলিত প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ আর বিশ্বাস।

উচ্চ পাহাড়ি সমবায় সমিতির লক্ষ্য শুধু ব্যবসা নয়, এ সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই চা চাষ, মানসম্মত উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা। সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। যেমন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, অর্গানিক উৎপাদন পদ্ধতির শিক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সদস্যদেরকে সঞ্চয় ও সহজ ঋণ সুবিধা, কৃষি উপকরণ যেমন জৈব সার ও যন্ত্রপাতি প্রদান করে থাকে। ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ফলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের আয় বেড়েছে, আর সম্মিলিত দর-কষাকষির ক্ষমতাও শক্তিশালী হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।

নেপালে উচ্চ পাহাড়ি চা উৎপাদক সমবায়ই প্রথম Code of Conduct (COC) সনদপ্রাপ্ত সমবায় এবং ২০০৯ সালে প্রথম অর্গানিক সার্টিফিকেশন অর্জনকারী সমবায়। সমবায়টি জার্মানির CERES Organic Certification Agency থেকে অর্গানিক সার্টিফিকেশন পেয়েছে এবং Fair Trade Certification অর্জন করেছে যা নিশ্চিত করে উৎপাদকরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন এবং শ্রম পরিবেশ নৈতিক মান বজায় রাখছে। এ সমিতির আরও একটি বড় অর্জন হলো "Nepal Tea - Quality from the Himalayas" ট্রেডমার্ক। এই স্বীকৃতি নেপালি চাকে বিশ্ববাজারে একটি শক্তিশালী পরিচয় দিয়েছে এবং ব্র্যান্ডের সুনাম রক্ষা করছে।

## গোরখা টি এস্টেট

ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। পাহাড়ের ঢালে কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন সাদা তুলোর চাদর। গাড়ি যখন ধীরে ধীরে ফিক্কালের দিকে উঠছিল, মনে হচ্ছিল কোনো ছবির ভেতর ঢুকে পড়েছি। দূরে সারি সারি চা বাগান সবুজ ঢেউয়ের মতো নেমে গেছে পাহাড়ের বুক বেয়ে। এই সবুজ সমুদ্রের মাঝেই রয়েছে গোরখা টি এস্টেট, একটি সফল কৃষিভিত্তিক সমবায় মডেলের উদাহরণ, যা উৎপাদন, রপ্তানি এবং পর্যটন

এই তিন ক্ষেত্রেই অবদান রাখছে।

সুন্দরপানি, ফিক্কাল এলাকায় অবস্থিত গোরখা টি এস্টেট একটি মাল্টি-কোঅপারেটিভ কোম্পানি, যা কৃষক, কারখানা ও বাজারকে একসাথে যুক্ত করে উচ্চমানের চা উৎপাদন করছে। এখানে বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে মোট প্রায় ১৬৫ হেক্টর জমিতে চা চাষ হয় এবং প্রায় ২৮০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি যুক্ত আছেন। একটি চা বাগান কীভাবে একটি সমাজকে বদলে দিতে পারে, তার জীবন্ত উদাহরণ যেন এটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই এস্টেট বছরে প্রায় ৮০ টন উচ্চমানের চা উৎপাদন করে এবং জার্মানি, ফিনল্যান্ড, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি তাদের তিনটি সহযোগী সমবায়কে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন নগদ সহায়তা দেয়, পাশাপাশি অতিরিক্ত বাজার বোনাসও প্রদান করে যা পাহাড়ি কৃষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়ায়। সবচেয়ে ভালো লাগল শুনে এখানে কৃষকদের সবুজ পাতার জন্য তুলনামূলক বেশি দাম দেওয়া হয়, যাতে তারা ভালো মানের উৎপাদনে উৎসাহ পায় এবং তাদের জীবিকা উন্নত হয়।

গোরখা টি এস্টেট শুধু চা উৎপাদনেই থেমে নেই। তারা কৃষকদের বাড়িতে হোমস্টে গড়ে তুলে "Tea and Tourism" ধারণাকে জনপ্রিয় করছে যেখানে ভ্রমণকারীরা স্থানীয় জীবনযাপন কাছ থেকে অনুভব করতে পারেন। এখানে এসে আরেকটি বিষয় আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল নারী ক্ষমতায়ন। প্রতিদিন বহু নারী হাতে চা পাতা তোলার কাজে যুক্ত। মাঠ থেকে মার্কেটিং, হিসাব থেকে মান নিয়ন্ত্রণ সব জায়গায় নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি।

এই এস্টেট শুধু ব্যবসা করে না কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়, বিনামূল্যে সরঞ্জাম বিতরণ করে, বায়োগ্যাস সুবিধা তৈরি করে কর্মীদের বিমা প্রদান করে সব মিলিয়ে একটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য সিনথেটিক রাসায়নিক কমিয়ে জৈব চাষ বাড়ানো এবং পরিবেশ রক্ষা করা। গোরখা টি এস্টেট জৈব সার্টিফিকেশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯ সাল থেকেই জার্মানিতে অর্থোডক্স চা রপ্তানি করছে এবং "সুন্দরপানি" ব্র্যান্ড নামে ১২৫টি জার্মান শহরে এটি বিক্রি হয়। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি চীনা বাজারেও প্রবেশ করেছে যা ভবিষ্যতে রপ্তানি আরও বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## চা টেস্টিং ইভেন্ট

আমাদের সফরের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল চা টেস্টিং সেশন। টেবিলে সারি সারি কাপ- সিলভার টি, গোল্ডেন টি, অর্থোডক্স গ্রিন, হোয়াইট টি। প্রথম চুমুকেই বোঝা যায় এ শুধু পানীয় নয়, এক ধরনের শিল্প। চায়ের সুগন্ধ যেন পাহাড়ি বাতাসে মিশে যায়। চা বাগানের ওপর তখন সূর্যের সোনালি আলো পড়ছিল। হঠাৎ মনে হলো এই ছোট্ট পাতার ভেতর কত গল্প! মানুষের শ্রম, প্রকৃতির দান, সহযোগিতার শক্তি, আর ভবিষ্যতের আশা।

## নেপালের চা সমবায় মডেল থেকে বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় দিক

বাংলাদেশ ও নেপাল দুই দেশই চা উৎপাদনকারী। দুই দেশেই রয়েছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি, পাহাড়ি অঞ্চল এবং শ্রমনির্ভর কৃষি তবুও বাস্তবতা ভিন্ন। নেপালের সমবায়গুলোতে কৃষক শুধু সদস্য নয়, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ। তারা ঠিক করে সবুজ পাতার ন্যায্যমূল্য, লাভের বণ্টন, প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগের অগ্রাধিকার। কৃষক জানে পাতা বিক্রি করেই গল্প শেষ নয়। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এবং আন্তর্জাতিক অর্গানিক সার্টিফিকেশনসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার। অন্যদিকে বাংলাদেশে চা চাষি এখনো অনেকাংশে শ্রমিক বা কাঁচামাল সরবরাহকারীর জায়গাতেই আটকে আছে। বাংলাদেশে অনেক চা বাগান এখনো কর্পোরেট মালিকানাধীন। ক্ষুদ্র চা চাষি থাকলেও তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণে মালিকানা নেই, ব্র্যান্ড বা রপ্তানিতে অংশগ্রহণ নেই। নেপালে চা সমবায়গুলো "Bush to Cup" মডেলে কাজ করে—পাতা তোলা → প্রক্রিয়াজাত → প্যাকেজিং → মার্কেটিং → রপ্তানি এতে কৃষক জানে তার চা কোনো দেশে যাচ্ছে, কী নামে বিক্রি হচ্ছে, কোনো মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে। বাংলাদেশে চা শ্রমিক বা ক্ষুদ্র চাষি প্রায় কখনোই জানেন না তাদের চা কোথায় যায়, কত দামে বিক্রি হয় বা ব্র্যান্ড ভ্যালু কত। নেপালে কৃষকের বাড়িতে হোমস্টে, চা বাগান পরিদর্শন, কারখানা ভিজিট, টি টেস্টিং সেশন ইত্যাদির মাধ্যমের 'Tea &Tourism' ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে সিলেট, পঞ্চগড়, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় চা কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। নেপালের মতো বাংলাদেশে কৃষককে ভ্যালু চেইন এর অংশ করতে হবে, শুধু উৎপাদন নয়, মার্কেট লিটারেসি শেখাতে হবে এবং সমবায়ভিত্তিক ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডেস্ক গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে ক্ষুদ্র চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি আয় সম্প্রসারণ হবে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি সম্প্রসারণ নিশ্চিত হবে। প্রয়োজন শুধু সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সহায়তা।

> **ইলামের উচ্চ ভূমিতে গড়া চায়ের বাগানগুলোতে তাজা পাতা থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক কাপ চা। ঝোপ থেকে কাপ পর্যন্ত এই যাত্রা শুধু একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি মানুষের দৃঢ়তা, সম্মিলিত উদ্যোগ এবং টেকসই ভবিষ্যতের গল্প।**

## ইলামের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে শেষ অনুভূতি

ইলামের উচ্চ ভূমিতে গড়া চায়ের বাগানগুলোতে তাজা পাতা থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক কাপ চা। ঝোপ থেকে কাপ পর্যন্ত এই যাত্রা শুধু একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি মানুষের দৃঢ়তা, সম্মিলিত উদ্যোগ এবং টেকসই ভবিষ্যতের গল্প। পাহাড়ি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র চাষিরা একা কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে পারত না। সমবায়ের মাধ্যমে তারা পেয়েছে ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য। ইলামের উচ্চ পাহাড়ি চা উৎপাদক সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং গোরখা টি এস্টেট এভাবে সমবায়ের দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ইলামের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা হাতে নিয়ে সূর্য ডুবে যেতে দেখলে মনে হয় এই ছোট্ট পাতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পাহাড়, মানুষের পরিশ্রম, আর একটি সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার শক্তি।

ইলাম, নেপালের সমবায় মডেল দেখিয়েছে কৃষককে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করলে, বাজারকে যুক্ত করলে এবং ব্র্যান্ড তৈরি করলে চা হতে পারে গ্রামীণ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিচয়ের শক্ত হাতিয়ার। বাংলাদেশের চা শিল্প ঐতিহ্যবাহী; এখন প্রয়োজন শুধু রূপান্তর। বাংলাদেশ সরকারের কৌশলগত বিনিয়োগ ও নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে চা শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নেওয়া সম্ভব।

**সাইয়েদাতুন নেছা:** যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

# আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সরকারি দাপ্তরিক কাজের সম্পৃক্ততা, প্রয়োগ সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ বিধান

মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান

বর্তমান সময়ে সরকারি দপ্তরগুলোর কাজের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বেড়েছে কাজের বৈচিত্র্য ও জটিলতা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) সরকারি প্রশাসনের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সেবার মানোন্নয়নে একটি কৌশলগত উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বর্তমান সময়ে সরকারি দাপ্তরিক কার্যক্রমে AI-এর ব্যবহারকে যৌক্তিক, সময়োপযোগী ও অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করছে। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনই একটি সহায়ক প্রযুক্তি, যা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজকে আরও সহজ, দ্রুত ও সুশৃঙ্খল করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারি দপ্তরের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে AI-এর সম্পৃক্ততা, ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভাবনা, যথাযথ প্রম্পট ব্যবহারের কৌশল, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকারি প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকসেবার মান উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি। ঐতিহ্যগতভাবে এসব কাজ মানবশ্রমনির্ভর হওয়ায় সময়, ব্যয় ও ত্রুটির ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথ্য বিশ্লেষণ, ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, স্বয়ংক্রিয়তা ও সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি কাজকে অধিকতর সহজ, স্মার্ট ও কার্যকর করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের বিকল্প নয় বরং মানবকেন্দ্রিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার একটি সহায়ক প্রযুক্তি যদি এর ব্যবহার হয় দক্ষতার সাথে।

## মানব বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তুলনামূলক চিত্র

| ক্ষেত্র | মানব বুদ্ধিমত্তা | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা |
|---|---|---|
| বুদ্ধিমত্তার উৎস | মানুষের মস্তিষ্কের জৈবিক কার্যক্রম, আবেগ ও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিমত্তা গড়ে ওঠে। | অ্যালগরিদম, ডেটা ও কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা তৈরি হয়। |
| শেখার প্রক্রিয়া | অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে। | ডেটা বিশ্লেষণ, প্যাটার্ন শনাক্তকরণ ও মডেল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখে। |
| সিদ্ধান্ত গ্রহণ | যুক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। | ডেটা, নিয়ম ও সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়; আবেগ নেই। |
| সৃজনশীলতা ও আবেগ | স্বাভাবিকভাবেই সৃজনশীল এবং আবেগপ্রবণ। | সৃজনশীলতার অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু অনুভূতি বা চেতনা নেই। |
| গতি ও নির্ভুলতা | তথ্য প্রক্রিয়াকরণে তুলনামূলক ধীর; ক্লান্তি প্রভাব ফেলে। | খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজ করে; ক্লান্ত হয় না। |
| সীমাবদ্ধতা | নতুন ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সহজে মানিয়ে নিতে পারে। | প্রোগ্রামিং, ডেটার মান ও পূর্বনির্ধারিত কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। |

## ১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: ধারণা ও প্রাসঙ্গিকতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি যা ডেটা, অ্যালগরিদম ও কম্পিউটিং শক্তির মাধ্যমে মানুষের মতো চিন্তা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। মেশিন লার্নিং (ML) ও জেনারেটিভ AI ব্যবহার করে বৃহৎ ডেটা বিশ্লেষণ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, ভাষা অনুবাদ, সারসংক্ষেপ প্রস্তুত এবং পূর্বাভাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে, যা সরকারি দপ্তরগুলোতে এসব সক্ষমতা কাজের দক্ষতা বহুগুণে বাড়াতে সহায়ক। অন্যদিকে মানব বুদ্ধিমত্তা আবেগ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যদিও মানব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতা ভিন্ন, তবুও আধুনিক সমাজে উভয়ের সমন্বিত প্রয়োগ নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

## ২. সরকারি দাপ্তরিক কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পৃক্ততা ও ব্যবহার

তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) বর্তমানে সরকারি দাপ্তরিক কার্যক্রমে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। নথি ব্যবস্থাপনা, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে AI এর ব্যবহার কাজের দক্ষতা, গতি ও নির্ভুলতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। মানবসম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে AI একটি কার্যকর সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্মার্ট ও জনবান্ধব কর্মক্ষেত্র গঠনের লক্ষ্যে সরকারি দাপ্তরিক কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পৃক্ততা ও যথাযথ ব্যবহার বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাপ্তরিক কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে-

- সময় সাশ্রয় হয়;
- পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের চাপ কমে;
- দাপ্তরিক লেখার মান উন্নত হয়;
- তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

নিম্নে দাপ্তরিক কাজের বিভিন্ন বিষয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

### ২.১ দাপ্তরিক নোট, পত্র ও প্রতিবেদন প্রস্তুত

দাপ্তরিক নোট, অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিভিন্ন প্রকার পত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি লিখনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। Generative AI ভিত্তিক টুল (যেমন: Microsoft Copilot, ChatGPT, Google Gemini, Deepseek) ব্যবহার করে প্রাথমিক বিভিন্ন খসড়া তৈরি করা যায়। এতে কর্মকর্তাগণ দ্রুত কাঠামোবদ্ধ লেখা পেয়ে থাকেন এবং পরবর্তী ধাপে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক যাচাই ও সংশোধন করতে পারেন।

### ২.২ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনা ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুত

দীর্ঘ প্রতিবেদন, নথি বা আইনি দলিল পর্যালোচনা করে সারসংক্ষেপ তৈরিতে Natural Language Processing (NLP) ভিত্তিক AI টুল কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া Summarization AI টুল ব্যবহার করে বড় ফাইল বা ডকুমেন্ট থেকে সারাংশ, মূল সিদ্ধান্ত কিংবা সুপারিশ আলাদা করে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজ হয় পাশাপাশি সময় ও শ্রম কমায়।

### ২.৩ সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত

দাপ্তরিক কোনো সভা আয়োজনের আগে এজেন্ডা প্রস্তুত এবং সভা শেষে কার্যবিবরণী (Minutes of Meeting) তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তা দিতে পারে। এক্ষেত্রে অডিও ট্রান্সক্রিপশন টুল (যেমন: Notion AI, Otter.ai, MS Teams AI features, Zoom ai) সভার আলোচনাকে লিখিতরূপে রূপান্তর করে নির্ভুল নথি প্রস্তুতে সহায়তা করে।

### ২.৪ ইমেইল যোগাযোগ

দাপ্তরিক ইমেইলে শুদ্ধ ব্যাকরণ, আনুষ্ঠানিক রীতি ও স্পষ্টতা বজায় রাখতে ইমেইল রাইটিং এসিস্টেন্ট হিসেবে Grammarly, Microsoft Editor-এর মতো AI টুল ব্যবহার করা যায়।

### ২.৫ প্রেজেন্টেশন ও ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন

কোনো দাপ্তরিক সভা বা প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতে AI-ভিত্তিক স্লাইড জেনারেটর ও চার্ট অটোমেশন টুল ব্যবহার করলে তথ্য উপস্থাপন অধিক কার্যকর ও সময়সাশ্রয়ী হয়। এছাড়া microsoft copilot, Gamma, Canva ইত্যাদি AI

টুলস দিয়ে কার্যকরভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুত করা যায়।

## ২.৬ বিজ্ঞাপন, ব্রশিওর ও সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি

দাপ্তরিক বিজ্ঞাপন, ব্রশিওর ও নাগরিক সেবামূলক কনটেন্ট তৈরিতে AI Design, Canva, Content Generation ইত্যাদি টুল সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

## ২.৭ অনুবাদ

দাপ্তরিক, একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে অনুবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সরকারি দপ্তরে আইন, নীতিমালা, প্রতিবেদন, চুক্তিপত্র, প্রশিক্ষণ মডিউল ও বৈদেশিক যোগাযোগ সংক্রান্ত নথি প্রায়ই একাধিক ভাষায় প্রস্তুত করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক অনুবাদ টুলস অনুবাদ কাজকে দ্রুত, সহজ ও কার্যকর করে তুলতে পারে। AI চালিত অনুবাদ টুলস খুব অল্প সময় বিপুল পরিমাণ নথি অনুবাদ করতে সক্ষম হয়। ফলে সময় ও জনবল সাশ্রয় হয়। এগুলো প্রাসঙ্গিক শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার ধরন বিশ্লেষণ করে তুলনামূলকভাবে নির্ভুল অনুবাদ প্রদান করে। বিশেষ করে বাংলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা অনুবাদে AI টুলস দাপ্তরিক কাজে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দিচ্ছে। অনুবাদ কাজে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য AI টুলস হলো- Google Translate (AI-powered), DeepL Translate, Microsoft Translator, ChatGPT, Google Gemini, Whisper (Speech-to-Text AI) ইত্যাদি। অনুবাদ কাজে এসকল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সরকারি দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতি, দক্ষতা ও বহুভাষিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ নথির ক্ষেত্রে মানবিক যাচাই ও সম্পাদনার মাধ্যমে AI অনুবাদ ব্যবহার করাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। মানব দক্ষতা ও AI প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়োগ দাপ্তরিক অনুবাদকে আরও নির্ভুল, পেশাদার ও কার্যকর করে তুলতে পারে।

## ৩. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমান সময়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। বিশেষ করে সরকারি দপ্তরে সময়, অর্থ এবং দক্ষ জনবলের সঠিক সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) ভিত্তিক টুলস এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় একটি কার্যকর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। দক্ষতার সাথে AI টুলস ব্যবহার করে প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কাজের সময় কমিয়ে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুলসগুলো অতীতের প্রকল্প তথ্য, বর্তমান ডেটা ও বিভিন্ন ভেরিয়েবল বিশ্লেষণ করে বাস্তবসম্মত প্রকল্প তৈরি করতে সহায়তা করে। কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সময়সূচি (Timeline) প্রণয়ন এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে AI নির্ভর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে প্রকল্প হয় অধিক তথ্যভিত্তিক, বাস্তবধর্মী, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য।

প্রকল্প বাস্তবায়নে AI টুলস স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং নির্ধারিত সময়সীমা বা বাজেট থেকে বিচ্যুতি হলে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা প্রদান করে। এতে প্রকল্প পরিচালকগণ আগেভাগেই সমস্যা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এছাড়া কর্মবণ্টন, টিম পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় AI কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারে। Microsoft Project (AI-assisted), Trello (AI Automation), Monday.com, Notion AI, ClickUp (AI Assistant) ইত্যাদি টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন, কাজের সময়সূচি তৈরি, টাস্ক লিস্ট প্রস্তুত করা যায়। পাশাপাশি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি তৈরি, প্রকল্পের রিপোর্ট ও সারসংক্ষেপ লেখা এবং তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করে।

মানব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বিত প্রয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তির বিস্তৃত ব্যবহার উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও টেকসই করবে।

## ৪. গবেষণা কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সরকারি দপ্তরে গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর করে তুলেছে। বৃহৎ পরিসরের সামাজিক ডেটা বিশ্লেষণ, প্রবণতা শনাক্তকরণ এবং নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে AI একটি শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরিপের তথ্য, জনমত বিশ্লেষণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ডেটা, জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান এবং আচরণগত তথ্য অল্প সময়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এসব ডেটার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও কোনো পরিবর্তনের পূর্বানুমান করতে পারে, যা মানব গবেষকদের পক্ষে একা করা কঠিন। ফলে গবেষণার গভীরতা ও পরিসর উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য AI টুলস হিসেবে NVivo (AI-assisted qualitative analysis), MAXQDA, Consensus.app, Scholar AI, ChatPDF AI, Academic AI, Tableau AI ব্যবহৃত হচ্ছে। এসকল AI টুলস সামাজিক ও পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ; জরিপের ফলাফল মূল্যায়ন; থিম শনাক্তকরণ; কোডিং ও প্যাটার্ন বিশ্লেষণ; টেক্সট, অডিও ও ভিডিও ডেটা বিশ্লেষণ; জটিল ডেটাকে গ্রাফ, চার্ট ও ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।

> **সরকারি দপ্তরে গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর করে তুলেছে।**

## ৫. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য AI ভিত্তিক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তুলেছে। সে হিসেবে, বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং এর আওতাধীন আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

AI প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের শেখার ধরন, সক্ষমতা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। Adaptive Learning System ব্যবহার করে দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী কনটেন্ট, অনুশীলন ও মূল্যায়ন প্রদান করা যায়। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের শেখার গতি ও দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

প্রশিক্ষণ কনটেন্ট প্রস্তুত ও ব্যবস্থাপনায়ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। AI চালিত টুলস ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ মডিউল, বিষয়ভিত্তিক প্রাইমার, প্রেজেন্টেশন, কুইজ ও মূল্যায়ন ডকুমেন্ট দ্রুত তৈরি করা যায়। পাশাপাশি বিদেশি ভাষায় রচিত প্রশিক্ষণ উপযোগী বিভিন্ন বই, সহায়ক ডকুমেন্টস অনুবাদ করে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায়।

এছাড়া, AI ভিত্তিক Learning Management System (LMS) প্রশিক্ষণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ এবং প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নে সহায়তা করে। ভার্চুয়াল ট্রেইনার, চ্যাটবট ও সিমুলেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

তবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবিক যোগাযোগ, নৈতিকতা ও তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে, একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মানব প্রশিক্ষক ও AI প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারই একটি আধুনিক, দক্ষ ও টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

### ৫.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য AI টুলস

**Moodle (AI plugins), Talent LMS, Canvas-**

- প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যবস্থাপনা
- প্রশিক্ষণার্থীর অগ্রগতি ও পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ
- প্রশিক্ষণের কনটেন্ট তৈরি

**ChatGPT/Copilot/Gemini-**

- প্রশিক্ষণ মডিউল ও লেসন প্ল্যান তৈরি
- কুইজ, প্রশ্ন ও অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর (Virtual Trainer) প্রদান

**Grammarly/Grok-**

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও রিপোর্টের ভাষাগত মান উন্নয়ন
- ব্যাকরণ, বানান ও পেশাদার লেখনশৈলী নিশ্চিতকরণ

**Canva AI/PowerPoint Copilot-**

- আকর্ষণীয় প্রেজেন্টেশন ও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি
- ইনফোগ্রাফিক ও ট্রেনিং স্লাইড ডিজাইন

**Quizizz AI / Kahoot AI-**

- ইন্টারঅ্যাকটিভ কুইজ ও মূল্যায়ন তৈরি
- প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ ও শেখার অগ্রগতি যাচাই

**Speech-to-Text & Translation AI, Google Speech AI, Whisper-**

- প্রশিক্ষণ সেশন রেকর্ড ও ট্রান্সক্রিপশন
- বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ ও সাবটাইটেল তৈরি

**Simulation & Virtual Lab AI, Labster, Virtual Reality-**

- বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা
- কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

**Tableau AI/Power BI AI-**

- প্রশিক্ষণ ফলাফল ও মূল্যায়ন ডেটা বিশ্লেষণ
- ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট তৈরি

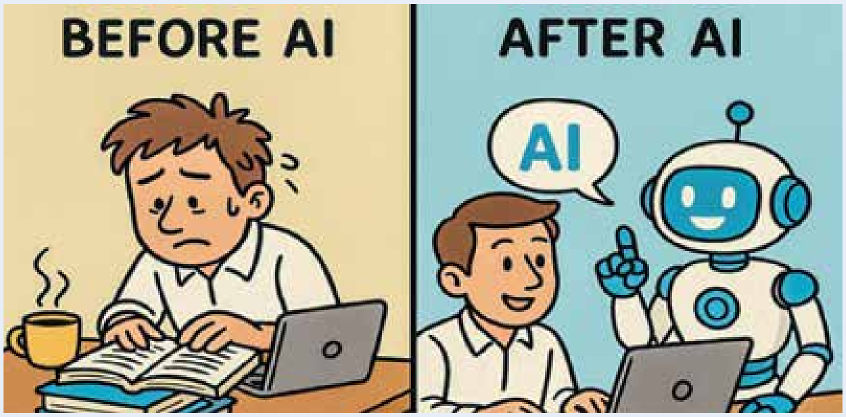


সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে AI টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান, গতি ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। মানব প্রশিক্ষকের দিক নির্দেশনা ও AI প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারই একটি আধুনিক ও টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

## ৬. সমবায় সমিতির কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ

প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সেবা ও খাতভিত্তিক কার্যক্রমে যেমন AI ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তেমনভাবে সমবায় অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের তদারকি, উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তরের দাপ্তরিক পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি যাচাই, বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ও সারসংক্ষেপ তৈরিতে AI ভিত্তিক টুল ব্যবহার করা যেতে পারে। বিপুল সংখ্যক সমিতির তথ্য থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল সমিতি চিহ্নিত করতে ডেটা অ্যানালিটিক্স ও মেশিন লার্নিং মডেল সহায়ক হতে পারে।

সমিতি পর্যায়ে সদস্য কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণ, ঋণ আদায় ও ঝুঁকি পূর্বাভাসে AI ব্যবহার করলে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে সমিতির কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কৃষি বা উৎপাদনমূলক সমবায় সমিতির উৎপাদন, পূর্বাভাস, বাজার বিশ্লেষণ এবং মূল্য নির্ধারণে AI ভিত্তিক decision support system প্রয়োগ করা সম্ভব। এছাড়া সমবায় সদস্যদের জন্য AI চ্যাটবট বা ডিজিটাল সহায়িকা চালু করলে সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি সুযোগ সুবিধা

সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করা যায়।

## ৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রম্পটের প্রয়োগ

প্রম্পট হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দেওয়া এমন নির্দেশনা, যার মাধ্যমে AI বুঝতে পারে কী কাজ করতে হবে এবং কোনো ধরনের ফলাফল তৈরি করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে যেকোনো কাজ বিশেষ করে সরকারি দাপ্তরিক কাজে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে ভাষা, আনুষ্ঠানিকতা ও তথ্যের যথার্থতা বজায় রাখা অপরিহার্য। সঠিকভাবে তৈরি করা প্রম্পট অফিস নোট, পত্র বা স্মারক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, তথ্যের সারসংক্ষেপ বা নথি প্রস্তুতিতে দ্রুত, নির্ভুল ও পেশাদার করে তোলে। কার্যকর প্রম্পট তৈরির জন্য চারটি বিষয় স্পষ্ট রাখতে হয়। প্রথমত: কাজের উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়ত: প্রেক্ষাপট, তৃতীয়ত: কাঙ্ক্ষিত আউটপুটের ধরন এবং চতুর্থত: সঠিকভাবে ভাষার ব্যবহার। স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং কাঙ্ক্ষিত মানের দাপ্তরিক ডকুমেন্ট বা নথি তৈরি করতে সহায়তা করে।

## ৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে নৈতিকতা, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে সরকারি কাজে যেখানে তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। AI তে কোনো তথ্য ব্যবহার করার আগে বুঝতে হবে সেটি সংবেদনশীল, ব্যক্তিগত বা গোপনীয় সরকারি তথ্য কী না। কারণ এ ধরনের ডেটা অদক্ষ, অসচেতন ও অনিরাপদভাবে ব্যবহার করলে তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন, তথ্য ফাঁস বা ভুল ব্যাখ্যার ঝুঁকি থাকে। এছাড়া, AI অনেক সময় অনুমানভিত্তিক বা প্রশিক্ষণ ডেটার ওপর ভিত্তি করে পক্ষপাতমূলক (bias) ফলাফল দিতে পারে। যার ফলে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্য দেখা যেতে পারে। তাই AI ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হলো ফলাফল যাচাই করা এবং প্রয়োজনে মানব বুদ্ধিমত্তা ও বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করা। আন্তর্জাতিকভাবে UNESCO এর AI Ethics Recommendation মানবকেন্দ্রিক, স্বচ্ছ, ন্যায়সংগত ও জবাবদিহিমূলক AI ব্যবহারের নীতিমালা নির্ধারণ করেছে, যাতে প্রযুক্তি মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা করে। একইভাবে বাংলাদেশের National Artificial Intelligence Readiness Assessment Report এ বলা হয়েছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে নৈতিক মানদণ্ড, ডেটা সুরক্ষা, গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের নীতিমালা অনুসরণ করা জরুরি। অর্থাৎ, AI ব্যবহারে দক্ষতা যত গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো দায়িত্ব, সতর্কতা ও নৈতিক মান বজায় রেখে প্রযুক্তি ব্যবহার করা, যাতে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু ঝুঁকি না তৈরি হয়।

## ৯. উৎকর্ষ বিধান ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

সরকারি দাপ্তরিক কাজে AI এর উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে প্রযুক্তি ব্যবহারে কার্যকারিতা বাড়ে এবং ঝুঁকি কমে। প্রথমত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি অর্থাৎ কর্মকর্তাদের AI কীভাবে এবং কী কী কাজে ব্যবহার করা যায়, কীভাবে সঠিক প্রম্পট দিতে হয়, কীভাবে আউটপুট যাচাই করতে হয়- এসব বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা ও ব্যবহার নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন, যাতে কোনো ধরনের তথ্য AI-তে দেওয়া যাবে, কোনোটি যাবে না, কীভাবে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে-এসব বিষয়ে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, দেশীয় ডেটা ও বাংলা ভাষাভিত্তিক AI উন্নয়ন জরুরি, কারণ স্থানীয় প্রেক্ষাপট, আইন, নীতি, পরিভাষা এবং সরকারি দাপ্তরিক ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত AI মডেলগুলো সবসময় সঠিকভাবে বুঝতে পারে না ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত ঐসমস্ত টুলসগুলো তার মতো করে তথ্য বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রদান করে; এক্ষেত্রে, দেশীয় ডেটা-ভিত্তিক মডেল তৈরি হলে সেটি অধিক নির্ভুল ফলাফল দিতে পারবে।

AI ব্যবহারে মানবিক তত্ত্বাবধান বজায় রাখা অপরিহার্য। কারণ, দাপ্তরিক কাজে AI সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সবসময় মানুষেরই নেওয়া উচিত, কারণ মানবিক বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক মূল্যবোধ AI এর দ্বারা পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত করা যায় না। অর্থাৎ, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, সঠিক নীতিমালা, দেশীয় সক্ষমতা ও সঠিক নজরদারি এই চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে সরকারি দপ্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে উৎকর্ষতা নিশ্চিত করতে পারে।

**AI ব্যবহারে মানবিক তত্ত্বাবধান বজায় রাখা অপরিহার্য। কারণ, দাপ্তরিক কাজে AI সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সবসময় মানুষেরই নেওয়া উচিত, কারণ মানবিক বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক মূল্যবোধ AI এর দ্বারা পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত করা যায় না।**

পরিশেষে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমান সময়ে সরকারি দপ্তরগুলোর জন্য শুধু একটি সহায়ক প্রযুক্তি নয়, বরং দাপ্তরিক কার্যক্রমকে দ্রুত, আধুনিক ও ডেটা-নির্ভর করার একটি রূপান্তরমূলক শক্তি। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নথি তৈরির গতি বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য বিশ্লেষণ এবং নাগরিক সেবায় স্বচ্ছতা-এসব ক্ষেত্রে AI কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এর সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে প্রয়োজন স্পষ্ট নীতিমালা, তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহারের চর্চা। সর্বোপরি এই প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। তাই সঠিক দিকনির্দেশনা ও দক্ষতার সমন্বয়ে AI সরকারি দাপ্তরিক কাজকে আরও কার্যকর, সময়োপযোগী, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব করে তুলতে পারে।

**মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান:** উপনিবন্ধক (পিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

## তথ্যসূত্র


- BKIICT, BCC, (2026). 'Artificial Intelligence and Cyber Security Fundamentals'. Dhaka: Bangladesh Computer Council (BCC).
- Government of the People's Republic of Bangladesh. (2025). National AI readiness assessment report: Towards ethical, inclusive and human-centered AI governance. Dhaka: a2i Programme, ICT Division.
- UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris: UNESCO.

# স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর: সংগ্রাম, ত্যাগ ও নেতৃত্বের এক প্রতিচ্ছবি

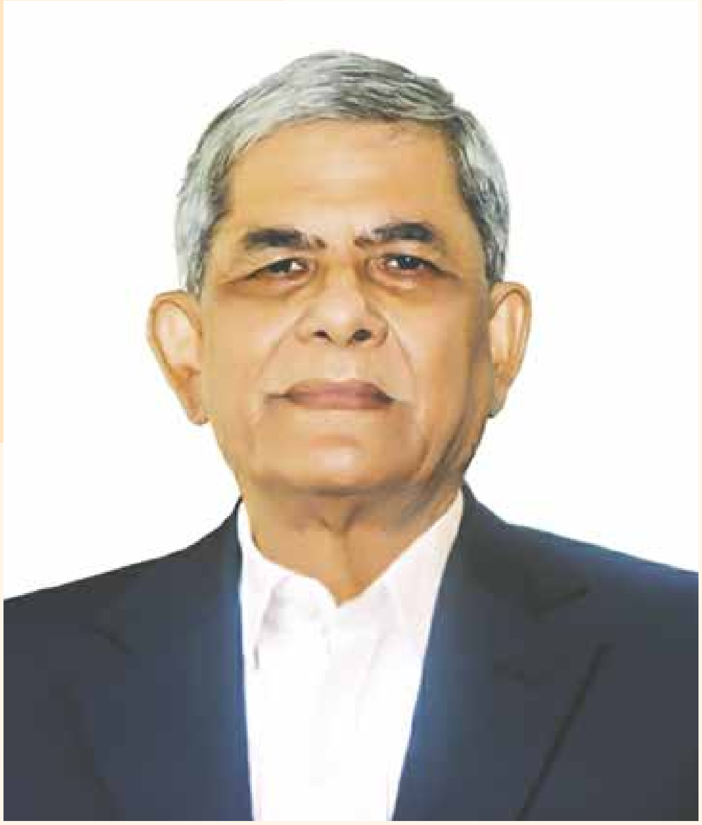

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করা এই রাজনীতিবিদ দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যে পদে তিনি ২০১৬ সালে অধিষ্ঠিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র থাকাকালীনই তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ষাটের দশকের উত্তাল সময়ে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে কারাবরণও করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শিক্ষা ক্যাডার)-এর একজন সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সরকারি কলেজে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করেন। তবে ১৯৮৬ সালে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে তিনি পূর্ণকালীন রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আসে ১৯৮৮ সালে, যখন তিনি ঠাকুরগাঁও পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯০-এর দশকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে দ্রুতই দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে উঠে আসেন। ২০০১ সালে তিনি ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং কৃষি ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দলের প্রতি তার নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৯ সালে তিনি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং ২০১১ সালে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিযুক্ত হন। সবশেষ ২০১৬ সালে তিনি দলের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রাহাত আরা বেগমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাদের দুই কন্যা রয়েছে। পারিবারিকভাবেও তিনি একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ধারক—তার পিতা মির্জা রুহুল আমিন ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী। এছাড়া তাঁর চাচা মির্জা গোলাম হাফিজ, সরকারের মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পীকার ছিলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জীবনপথে শিক্ষা, সংগ্রাম ও নেতৃত্বের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়। শিক্ষকতা থেকে শুরু করে দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বে পৌঁছানো—তার এই যাত্রা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

# তৃণমূল থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায়: প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পথচলা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনে জনাব মীর শাহে আলমকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর শাহে আলম গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।

মীর শাহে আলম বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃণমূল থেকে উঠে আসা এক পরিচিত নাম। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর একজন সক্রিয় নেতা এবং বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য।

## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

১৯৭০ সালের ৭ আগস্ট বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন মীর শাহে আলম। শৈশব ও বেড়ে ওঠা শিবগঞ্জে—যে মাটির সঙ্গে তাঁর আবেগ, সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক ভিত্তি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

তিনি মোছাঃ রাজেনা বেগম ও প্রয়াত মীর মোজাফফর রহমানের ছয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম। তাঁর সহধর্মিণী মীর লাবণী আক্তার। তাঁদের পরিবারে রয়েছে দুই পুত্র—মীর শাকরুল আলম সিমান্ত ও মীর সাকলাইন আলম দিগন্ত এবং এক কন্যা মীর সামারা সুনাত কায়নাত।

তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। চাচা মীর আবু জাকের মাকু স্থানীয় বিএনপির নেতৃত্বে সক্রিয়, বড় ভাই মীর আইনুর রহমানও দলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতা নতুন প্রজন্মেও বজায় রয়েছে—তাঁর বড় ছেলে মীর শাকরুল আলম সিমান্ত ইতোমধ্যে ছাত্ররাজনীতিতে যুক্ত।

একইসঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী ঢাকা ও বগুড়ায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে পরিবারটির সামাজিক সম্পৃক্ততাকে আরও সুদৃঢ় করেছেন।

## রাজনৈতিক জীবন

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু।

১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদানের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন:

- ১৯৯১: উপজেলা ছাত্রদলের সম্পাদক
- ১৯৯২: জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক

মাত্র ২৩ বছর বয়সে, ১৯৯৭ সালে আটমূল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনি নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন করেন:

- ২০০২: শিবগঞ্জ পৌর বিএনপির আহ্বায়ক
- ২০০৯: শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
- ২০১০: উপজেলা বিএনপির সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক
- ২০১৩ ও ২০২২: উপজেলা বিএনপির সভাপতি
- ২০২২: জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি

২০২৬ সালে বগুড়া-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি বহন করে।

## উল্লেখযোগ্য অবদান

সাফল্যমণ্ডিত রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং রূপসী বিডি গ্রুপের চেয়ারম্যান। তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রম এগ্রো, নিউট্রিশন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত, যা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও তিনি সমানভাবে সক্রিয়। তিনি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর পরিচালক হিসেবে দুই দফায় দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে শিল্পখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ক্রীড়াকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি নিজ এলাকায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও ক্রীড়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এসব উদ্যোগ তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক কল্যাণ এবং তরুণ প্রজন্মের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

# আমানত সুরক্ষা তহবিল কী এবং কেন

মোঃ মিজানুর রহমান

## সঞ্চয়ের ভরসা—কতটা নিরাপদ?

বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহরে সমবায় আজ আর কেবল একটি সংগঠন নয়; এটি বহু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। কৃষক তার ফসলের টাকা জমা রাখেন এখানে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তার ঘূর্ণায়মান পুঁজি, পেশাজীবী মানুষ তার সঞ্চয়ের একটি অংশ, আর প্রান্তিক নারীরা তাদের ভবিষ্যতের সম্বল।

কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে: এই সঞ্চয় কি সত্যিই নিরাপদ?

যখন কোনো সমবায় সমিতি হঠাৎ ভেঙে পড়ে, কিংবা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতায় আমানত ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ক্ষতিটা শুধু আর্থিক থাকে না; এটি ভেঙে দেয় মানুষের আস্থা। আর মানুষের আস্থা হারালে যেকোনো আর্থিক কাঠামোই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই বাস্তবতার মধ্যেই সামনে আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা—সমবায় খাতে আমানত সুরক্ষা তহবিল।

## সম্ভাবনার ভিতরে লুকিয়ে থাকা ঝুঁকি

বাংলাদেশের সমবায় খাত একটি বিশাল ও বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ সদস্য, হাজার হাজার নিবন্ধিত সমিতি এবং ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়ের সমন্বয়ে এটি অনেক ক্ষেত্রে একটি বিকল্প, এমনকি অনেকের জন্য একমাত্র community-based আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

কিন্তু এই বিস্তৃত কাঠামোর ভেতরে একটি মৌলিক দুর্বলতা রয়ে গেছে—আমানত সুরক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা নেই।

ব্যাংকিং খাতে কোনো ব্যাংক ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্ট ফান্ড আমানতকারীদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়, যা একটি বিস্তৃত financial safety net-এর অংশ হিসেবে কাজ করে। সমবায় খাতে তেমন কোনো নিরাপত্তা বলয় না থাকায় একটি সমবায় সমিতি ব্যর্থ হলে ক্ষুদ্র আমানতকারীরা প্রায় সম্পূর্ণ ঝুঁকির মুখে পড়েন।

এর ফলে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে contagion risk বা আস্থা-সংক্রমণজনিত ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিকে অনেক বিশেষজ্ঞ "informal risk concentration" হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেখানে বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্র সঞ্চয় একটি অরক্ষিত কাঠামোর মধ্যে জমা থাকে।

## একটি সহজ ধারণা, গভীর প্রভাব

আমানত সুরক্ষা তহবিলের ধারণাটি জটিল নয়, কিন্তু এর প্রভাব গভীর। এটি একটি "loss absorption framework" হিসেবে কাজ করে, যাতে কোনো একক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা পুরো ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি না করে। সহজভাবে বললে, এটি এমন একটি সম্মিলিত সুরক্ষা বলয়, যা সম্ভাব্য আর্থিক ধাক্কাকে সামাল দেয় এবং আমানতকারীদের আস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিকভাবে এটিকে একটি বৃহত্তর "financial safety net"-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, তদারকি ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা এবং লিকুইডেশন কাঠামোও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই কাঠামোর আওতায় সমবায় সমিতিগুলো নিয়মিতভাবে একটি নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গড়ে ওঠে। কোনো সমবায় ব্যর্থ হলে সেই তহবিল থেকে সদস্যদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেরত দেওয়া হয়।

পুরো ব্যবস্থাটি মূলত একটি "collective risk-sharing mechanism", যেখানে সবাই মিলে ঝুঁকি ভাগ করে নেয়। এটি এমন একটি পূর্ব-প্রস্তুত নিরাপত্তা কাঠামো বা ex-ante funding model, যা ক্ষতির পর প্রতিক্রিয়া দেখায় না; বরং সম্ভাব্য ঝুঁকিকে আগেই বিবেচনায় নিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করে।

গবেষণা বলছে, এই ধরনের কাঠামো আর্থিক খাতে আস্থা বৃদ্ধি করে এবং systemic risk কমাতে সহায়তা করে।

ব্যাংকিং খাতে এই মডেল বহুদিন ধরেই সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের FDIC (www.fdic.gov), ভারতের DICGC (www.dicgc.org.in), এবং কোরিয়ার KDIC (www.kdic.or.kr) একই ধরনের প্রিমিয়ামভিত্তিক তহবিল কাঠামোর মাধ্যমে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদান করে আসছে। সব ক্ষেত্রেই একই মূল দর্শন কাজ করে: আমানতকারীর আস্থা রক্ষা মানেই আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

## কেন এখন?

সমবায় খাতে আমানত সুরক্ষা তহবিলের প্রয়োজনীয়তা এখন আর তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; এটি একটি নীতিগত অপরিহার্যতায় পরিণত হয়েছে।

প্রথমত, এটি আস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যম। সমবায়ের সদস্যদের বড় অংশই ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী। তাদের জন্য একটি নিরাপত্তা কাঠামো থাকলে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়বে, যা সরাসরি সমবায়ের মূলধন শক্তিশালী করবে।

দ্বিতীয়ত, এটি শৃঙ্খলা আনে। যখন সমবায়গুলোকে প্রিমিয়াম দিতে হয়, তখন তারা তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আরও সতর্ক হয়। এটি এক ধরনের "market discipline" তৈরি করে।

তৃতীয়ত, এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করে। যারা ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে, তারা সমবায়ের মাধ্যমে নিরাপদে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হয়।

তবে আমানত সুরক্ষা তহবিলের গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়।

**সমবায় খাতে আমানত সুরক্ষা তহবিলের প্রয়োজনীয়তা এখন আর তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; এটি একটি নীতিগত অপরিহার্যতায় পরিণত হয়েছে।**

## কেবল সুরক্ষা নয়, স্থিতিশীলতারও প্রশ্ন

আমানত সুরক্ষা তহবিলকে অনেক সময় কেবল ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর সুরক্ষা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি বৃহত্তর আর্থিক স্থিতিশীলতা কাঠামোর অংশ।

যখন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়, তখন তার প্রভাব কেবল সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি দ্রুত আস্থার সংকটে রূপ নেয় এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় contagion—যেখানে একটি ব্যর্থতা পুরো ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় "bank run" বা ব্যাপক অর্থ উত্তোলনের প্রবণতা তৈরি করে।

সমবায় খাতেও একই ধরনের ঝুঁকি বিদ্যমান। একটি সমবায় সমিতির ব্যর্থতা অন্য সমিতিগুলোর প্রতি আস্থার ঘাটতি তৈরি করতে পারে, যার ফলে সদস্যরা হঠাৎ সঞ্চয় তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখাতে পারেন। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে এটি একটি পদ্ধতিগত (systemic) অস্থিতিশীলতায় রূপ নিতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে আমানত সুরক্ষা তহবিল একটি "shock absorber" হিসেবে কাজ করে। এটি নিশ্চিত করে যে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা পুরো ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলবে না। বরং ক্ষতিকে সীমিত রেখে আস্থার ভিত্তি অটুট রাখে।

অর্থাৎ, আমানত সুরক্ষা তহবিল কেবল ব্যক্তিগত সঞ্চয় রক্ষা করে না; এটি পুরো আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

## বিশ্ব থেকে শিক্ষা, আমাদের বাস্তবতা

আমানত সুরক্ষা তহবিল কোনো নতুন ধারণা নয়; এটি বিশ্বজুড়ে আর্থিক ব্যবস্থার একটি পরীক্ষিত নিরাপত্তা কাঠামো। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই সুরক্ষা এখন আর কেবল ব্যাংকিং খাতে সীমাবদ্ধ নেই।

রুয়ান্ডায় সেভিংস অ্যান্ড ক্রেডিট কোঅপারেটিভ (SACCO) সমিতিগুলোকে জাতীয় আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে, ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আস্থা বেড়েছে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি শক্তিশালী হয়েছে। একইভাবে, কেনিয়ায় ডিপোজিট

**একটি কার্যকর আমানত সুরক্ষা তহবিল সেই আস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। এটি ক্ষুদ্র আমানতকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সমবায় খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল করে।**

ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের অধীনে শর্তসাপেক্ষে সমবায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ রয়েছে। কানাডায় প্রাদেশিক পর্যায়ে পরিচালিত ক্রেডিট ইউনিয়ন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা সদস্যদের আমানত সুরক্ষার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এসব অভিজ্ঞতা একটি বিষয় স্পষ্ট করে যে, সমবায় খাতকে টেকসই করতে কেবল নিবন্ধন ও তদারকি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি বিশ্বাসযোগ্য সুরক্ষা কাঠামো।

বাংলাদেশে এই প্রশ্নটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাংকিং খাতে আইনগত সুরক্ষা থাকলেও সমবায় খাত এখনও সেই নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে। "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করলেও সমবায় আইন, ২০০১-এর ২৬খ ধারায় আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি।

ফলে একটি স্পষ্ট নীতিগত বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে—একই ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাত সুরক্ষিত, আর সমবায় খাত রয়ে গেছে ঝুঁকির মধ্যে। এই ব্যবধানই সমবায় খাতে আস্থা, স্থিতিশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## সতর্কতা: সুরক্ষাই যেন ঝুঁকিতে না পরিণত হয়

আমানত সুরক্ষা তহবিলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো "নৈতিক ঝুঁকি" (Moral Hazard)। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান জানবে যে ব্যর্থ হলেও আমানতকারীদের একটি অংশ সুরক্ষিত থাকবে, তখন অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। একইভাবে, সদস্যদের মধ্যেও একটি ভ্রান্ত নিরাপত্তাবোধ তৈরি হতে পারে, যেখানে তারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার দিকে কম মনোযোগ দিতে পারে। যদি সমবায়গুলো মনে করে যে, যাই হোক আমানত সুরক্ষিত থাকবে, তাহলে তারা অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে পারে।

এছাড়া তহবিলের আকার ও গঠন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, দুর্বল তদারকি, তথ্য ঘাটতি এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় তহবিলের কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এসকল বিষয়ে আরও ব্যাপক পরিসরে তথ্যভিত্তিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

তাই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আমানত সুরক্ষা তহবিল কেবল গঠন করাই যথেষ্ট নয়; এর সঙ্গে শক্তিশালী তদারকি, স্বচ্ছ শাসন এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি।

## সামনে এগোনোর রূপরেখা

সমবায় খাতে একটি কার্যকর আমানত সুরক্ষা তহবিল গড়ে তুলতে হলে কিছু নীতিগত দিক স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি।

প্রথমত, একটি বাস্তবসম্মত কভারেজ সীমা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র আমানতকারীরা সর্বাধিক সুরক্ষা পান, কিন্তু একই সঙ্গে তহবিলের ওপর অতিরিক্ত চাপও তৈরি না হয়। এই ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, প্রিমিয়াম কাঠামো এমন হতে হবে, যা ঝুঁকির মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, ভালোভাবে পরিচালিত সমবায় সমিতি কম প্রিমিয়াম দেবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সমিতিগুলো বেশি। এর মাধ্যমে একটি প্রণোদনাভিত্তিক শৃঙ্খলা (incentive-compatible discipline) গড়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়ত, একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ডিজিটাল ডাটাবেইজ, নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং কার্যকর নিরীক্ষা ছাড়া এই ধরনের তহবিল টেকসইভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, তহবিলের শাসন কাঠামো হতে হবে স্বচ্ছ, পেশাদার এবং জবাবদিহিমূলক। এতে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং সমবায় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো প্রয়োজন।

পঞ্চমত, এই তহবিলকে বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বিত নীতিগত সহযোগিতা ছাড়া এই উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে।

সবশেষে, এই পুরো কাঠামোকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে বড় ও আর্থিকভাবে সক্রিয় সমবায়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তীতে তা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

## আস্থা ফিরলে সমবায়ই হবে শক্তির উৎস

সমবায় কেবল একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়—এটি একটি সামাজিক চুক্তি।

এই চুক্তির ভিত্তি হলো আস্থা।

একটি কার্যকর আমানত সুরক্ষা তহবিল সেই আস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। এটি ক্ষুদ্র আমানতকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সমবায় খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল করে। একই সঙ্গে এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নিরাপদ সঞ্চয় পরিবেশ তৈরি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে দেয়।

সমবায়ের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী করতে হলে সঞ্চয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই হবে। আমানত সুরক্ষা তহবিল কার্যকর করা তার মধ্যে অন্যতম।

**মোঃ মিজানুর রহমান:** যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

# সমবায়ে যুবকদের অংশগ্রহণ ও টেকসই উদ্যোগের বিকাশ

আইরিন খানম

সমবায় আন্দোলন একটি শক্তিশালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, যা যুবদের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যুবরা সমবায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বব্যাপী যুব-উদ্যোক্তারা বর্তমানে সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা কেবল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করছে না, বরং সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তাদের উদ্ভাবনী ধারণা, সৃজনশীলতা এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী উদ্যোগগুলো দেশ ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করছে। বাংলাদেশে যুব উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তারা বিভিন্ন ধরনের স্টার্টআপ, সামাজিক উদ্যোগ এবং ডিজিটাল ব্যবসা তৈরি করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিচ্ছে। তাদের উদ্ভাবনী ধারণা এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশে অনেক নতুন উদ্যোগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

## যুব-উদ্যোক্তা সৃজনে সমবায়

উদ্যোক্তা হলো এমন একজন ব্যক্তি, যিনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার ঝুঁকি নেন এবং সেই উদ্যোগকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উদ্যোক্তা শব্দটি এসেছে ইংরেজি “Entrepreneur” শব্দ থেকে, যার অর্থ একজন উদ্যোগ গ্রহণকারী। বস্তুত, উদ্যোক্তা এমন ব্যক্তি, যিনি সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা দিয়ে নতুন উদ্যোগ তৈরি করেন। ২০১২ সাল থেকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (Demographic dividend) এর যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। অত্যন্ত গুরুত্বের

সঙ্গে কর্মমুখী জনসংখ্যার এই ডিভিডেন্ডকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে সরকার ইতোমধ্যেই মানব সম্পদ তৈরির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ, যার ৬৫.২৭% জনসংখ্যাই এখন ১৫-৬৪ বছর বয়সের মধ্যে , ৬৫ বছরের উর্ধ্বে রয়েছে মাত্র ৫.৯২% এবং ০-১৪ বছর বয়সের মধ্যে ২৮.৮১%। এই সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সমবায়ের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তাদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে দক্ষতা অর্জন ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে, যেখানে ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ২১৬ জন। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের সমন্বয়ে মোট ৩৫৩০ কোটি টাকার শেয়ার মূলধন, ২৭৮৭৬ কোটি টাকার সঞ্চয় আমানত এবং অন্যান্য তহবিল ছাড়াও মোট ৩৮১০৭ কোটি টাকার কার্যকরী মূলধন গড়ে উঠেছে। যা সমবায়ীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজি, এখানে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নেই। এ পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৪২ জন ব্যক্তি সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে (এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর)। সমবায় বিভাগ কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ, ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিসহ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহও আইসিটিসহ বিভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ সমবায়ীগণ এসকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে উদ্যোক্তা। ২০২৪-২৫ সনে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিসহ ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহে মোট ৪৮ হাজার ৩৭৩ জনকে ১৮২০টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫)। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল পুরস্কারজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর থ্রি জিরোর তত্ত্বের প্রতিটি বিষয়ই সমবায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত: জিরো প্রভার্টি, জিরো কার্বন এবং জিরো আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রেই সমবায়ী এন্টারপ্রাইজ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সারাদেশে সমবায়ীরা নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করে। যেমন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মৎস্য, তাঁত পণ্য, ব্লক ও বাটিক, সেলাই, হাতের কাজ, জামদানি শাড়ি, বেত ও দড়ির নিত্য ব্যবহার্য জিনিস, কাঠের খেলনা ও সৌখিন পণ্য, মাটির তৈরি বাসন, পাত্র, ফুলদানি, নার্সারি, পোল্ট্রি, মৎস্য ও গবাদি পশুর খাদ্য ইত্যাদি। এসকল পণ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্যালু এডিশন এবং একটি শক্তিশালী সমবায় বাজার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সম্ভব হলে বাজার থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা বিদায় নিবে, ভেজালকারীরা অপসারিত হবে।

## যুবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমবায়ী এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এবং উদ্যোক্তা সৃজনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

### ১. অর্থায়নের অভাব

যুব-উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদের নতুন উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের সমস্যা। সাধারণত নতুন উদ্যোক্তাদের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা এবং বিনিয়োগের উৎস কম থাকে, যা তাদের উদ্যোগ চালু এবং পরিচালনার জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও সমবায় উদ্যোক্তা সৃজনে সমবায় অধিদপ্তরের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, তথাপি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে এবং ব্যবসা প্রসারে অর্থায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় সমিতিসমূহ নিজেদের শেয়ার-সঞ্চয় এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব মূলধন/পুঁজি পর্যাপ্ত হয় না। সমবায়ে অর্থায়নের জন্য কোনো বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই, সমবায় ব্যাংক থাকলেও সেটি তফসিলিভুক্ত নয় এবং যার কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র সমবায়ীরা বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির শর্তসমূহ পালন করতে পারে না। ফলে অনেক সমবায় উদ্যোগ অর্থায়নের অভাবে আলোর মুখ দেখে না।

> **যেহেতু অনেক তরুণ উদ্যোক্তা প্রাথমিকভাবে নতুন উদ্যোগ শুরু করেন, তাদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকে। এ অভিজ্ঞতার অভাব ব্যবসায়ের চালনা, বাজার বিশ্লেষণ এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে**

### ২. অভিজ্ঞতার অভাব

যেহেতু অনেক তরুণ উদ্যোক্তা প্রাথমিকভাবে নতুন উদ্যোগ শুরু করেন, তাদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকে। এ অভিজ্ঞতার অভাব ব্যবসায়ের চালনা, বাজার বিশ্লেষণ এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে প্রচার না থাকায়, সাধারণ মানুষের এ সংক্রান্ত ধারণা নাই।

### ৩. বাজার প্রতিযোগিতা এবং বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব

বাজারে প্রবেশ করার সময় যুব-উদ্যোক্তাদের অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় তাদের পুঁজির অভাব, মার্কেটিং শক্তি এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ক্ষমতা কম থাকে। আমাদের দেশে সমবায় দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান 'মিল্ক ভিটা' একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে মার্কেটিং এর দৃষ্টান্ত, যদিও প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে নাই। আমাদের দেশে কৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়ভিত্তিক ভেল্যু চেইন ব্যবস্থার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এখন পর্যন্ত গড়ে উঠে নাই।

### ৪. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও সমবায়ের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি

নতুন ধারণা বা প্রযুক্তির ব্যাপারে সমাজে অবস্থা পরিবর্তন সহজ নয়। অনেক সময় সমাজ নতুন উদ্যোগগুলো গ্রহণে তাড়াহুড়ো করে না, যা তাদের ব্যবসার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সমবায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। অন্যদিকে, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সমবায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে

কিছুটা নেতিবাচক ধারণা রয়েছে।

### ৫. বিনিয়োগে ব্যর্থতার ভয় ও উৎসাহের অভাব

সমবায় যদিও সম্মিলিত প্রয়াস, তবুও অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন মতের জন্য বিনিয়োগে যাওয়া সম্ভব হয় না। ছোট সমবায় সমিতিগুলো তাদের কষ্টের সঞ্চয় সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ হবে না মনে করে, কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া, তরুণ প্রজন্ম নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তির জটিলতার কারণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তাদের, যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ নষ্ট করে।

### ৬. সহযোগী বিমা প্রতিষ্ঠানের অভাব

সকল ক্ষেত্রেই ভালো বিমা প্রতিষ্ঠান না থাকায়, ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণকে ঝুঁকিগ্রস্ত করে ফেলে। যেমন, সমবায়ভিত্তিক ডেইরি প্রজেক্টের প্রসার হওয়া সত্ত্বেও ভালো খামার গড়ে উঠছে না, কারণ যুবকরা বিমা প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় ঝুঁকি নিতে পারছে না, অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা অনেক বেশি মাসিক প্রিমিয়ার চার্জ করে থাকে।

## যুবকদের ব্যবসায়ী উদ্যোগসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনায় করণীয় ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় করণীয়

### ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

যুবকদের নতুন উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। অর্থনীতি, বিপণন, বিক্রয় কৌশল এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন শেখা গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত কোর্সসহ নিয়মিত উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ করার উদ্যোগ নিতে পারে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সমবায়ীদের এ সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে ডিজিটাল টুল, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এবং ই-কমার্স বিষয়ে দক্ষতা অর্জন আবশ্যক, পাশাপাশি অভিজ্ঞ মেন্টরদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে, সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং ইনস্টিটিউটসমূহ উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

### ২. অর্থায়ন ও বিনিয়োগ

নতুন উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি ব্যবসার শুরু থেকে এর সম্প্রসারণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সঠিক অর্থায়ন অপরিহার্য। প্রথমেই ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন জোগাড়ের জন্য একটি পরিষ্কার ও কার্যকর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সমবায় অধিদপ্তর বিনিয়োগ সম্পর্কে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা/বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করতে পারে। অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য খরচ কমানোর কৌশল এবং লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। এসএমই লোন সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে এমওইউ, সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালীকরণ ও সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে সমিতিকে ঋণ প্রদান, জিওবি ও ফরেন ফান্ডের প্রজেক্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে সহায়তা করা যেতে পারে। সমবায়ীদের পরিকল্পিত অর্থায়ন ও বিনিয়োগ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সমবায়ে অর্থায়নে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

### ৩. মেন্টরশিপ ও দিকনির্দেশনা

ব্যবসায় উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে মেন্টরশিপ ও দিকনির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন অভিজ্ঞ মেন্টরের দিকনির্দেশনা উদ্যোক্তাদের সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। মেন্টররা সাধারণত বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা এবং সফলতার গল্প শেয়ার করে যা তরুণ উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করে। সমবায়ীদের উন্নয়নে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সফল জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের বক্তা হিসেবে রাখা যেতে পারে। এছাড়া, হাতে কলমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন এন্টারপ্রাইজে ফিল্ড ভিজিট রাখা যেতে পারে।

### ৪. সরকারি সহায়তা

উদ্যোক্তাদের সফলতা নিশ্চিত করতে সরকারি সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসার প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায়ীদের মূলধন সংগ্রহের জন্য সরকারি ব্যাংক ও

সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে পণ্য প্রচার, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য রফতানি সুবিধা তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়। পরিকল্পিতভাবে সরকারি সহায়তা কাজে লাগালে উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসাকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন।

## ৫. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মার্কেটিং

যুব-উদ্যোক্তাদের সফলতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং মার্কেটিং অপরিহার্য। ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা Knowledge based society-কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। Information and Communication Technology (ICT) হচ্ছে এই Knowledge based society তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নতুন বাংলাদেশের লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক সরকার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, দ্রুত সেবা, কম খরচ, যুগোপযোগী মাধ্যম, টেকসই অর্থনীতি ইত্যাদি। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যুগোপযোগী টেকসই সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের অডিট ও হিসাব ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন সম্ভব হবে। আর এজন্য সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগ ও দক্ষ সমবায়ীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই।

**যুবক সমবায়ী উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।**

## সমবায়ের মাধ্যমে যুবকদের টেকসই উদ্যোগের বিকাশ

যুবক সমবায়ী উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান যুগে বেকারত্ব একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে যুব-উদ্যোক্তারা স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে। তারা স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ অনলাইন ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-কমার্স সাইটগুলোর মাধ্যমে তরুণরা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে হাজারো মানুষের আয়ের পথ খুলে দিচ্ছে। যুবকরা অধিকাংশ সময় নতুন চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমাজে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসে। বর্তমান চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেড- আইটি প্রশিক্ষণ, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, হাওড় এলাকায় অ্যাকুপনিক্স প্রযুক্তির প্রসার ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, ফিস প্রসেসিং, ক্যাটারিং সার্ভিস, ই-কমার্স, স্টার্ট আপ বিজনেস, ফ্রি-ল্যান্সিং, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও টেকনোপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে নতুন কর্মক্ষেত্র প্রসার এর সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, যুব-উদ্যোক্তারা সাধারণত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং তাদের ব্যবসার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সমবায়ী ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগ সামাজিক ব্যবসার ধারণাকেই প্রসারিত করে এবং কো-অপারেটিভ সোশ্যাল ভেল্যুকে ধারণ করে সমাজের উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়া, যুব-উদ্যোক্তারা ই-কমার্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ব্লকচেইন ও ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকসেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। উদাহরণস্বরূপ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা দ্রুত এবং সহজলভ্য হচ্ছে। প্রতি বছর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সকল সমবায়ীদের পাশাপাশি শুধু নারীদের জন্য স্পেশিয়ালাইজড আইজিএ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সমবায় অধিদপ্তর। এছাড়া মূলধারার সমবায় সমিতিগুলো গ্রামীণ শিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে ফলে তৈরি হয়েছে অনেক নারী উদ্যোক্তা। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে। সমবায়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, যেমন পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি, সৌরবিদ্যুৎ এবং জ্বালানিসাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হবে। যুব-উদ্যোক্তারা প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাজ করছেন, যেখানে সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতি গঠনমূলক অন্যতম একটি দপ্তর। সমবায় বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সমবায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব মূলধন ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে আবাসন খাত, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণ প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে সমবায়ী উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমবায়ে যুবদের অংশগ্রহণ শুধু তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়, বরং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের উদ্যম আর সমবায়ের শক্তি মিলিত হলে, সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

## তথ্যসূত্র


- বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য, এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
- বিবিএস জনশুমারি ২০২২।
- "তরুণ উদ্যোক্তারা সমাজের পরিবর্তনশীল শক্তি", বণিক বার্তা, ২২/০২/২০২৫।
- হুমায়ুন ফরিদ, "তরুণ উদ্যোক্তা যেভাবে সফল হতে পারে", যুগান্তর, ২৮/১১/২০২৪।



**আইরিন খানম:** উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

# নতুন যুগের সমবায়
# প্রযুক্তি ও সহযোগিতার নতুন অর্থনীতি

প্রকৌশলী ফারহানা ফেরদৌসী

সমবায়ের সূচনা সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। ব্যক্তি এবং স্থান উল্লেখ না করলে বলা যায় পারস্পরিক সহায়তা, বিশ্বাস আর যৌথ-শ্রমের উপর ভিত্তি করেই সমবায়ের উৎপত্তি। এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন এজন্যই হয়েছিল কারণ ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যবসা করার তেমন পুঁজি কিংবা দক্ষতা ছিল না। কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগেও সমবায় শুধুমাত্র দুগ্ধ আর মৎস্য ব্যবসায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন জগতেও এর সংযোগ প্রয়োজন। ড্রোনচালিত কৃষি, ব্লকচেইন নির্ভর আর্থিক-ব্যবস্থাপনা, ই-কমার্স, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিসহ প্রযুক্তির সকল খাতেই সমবায় ব্যবসা পদ্ধতি বিস্তৃত হতে পারে। সমবায়ের মূলনীতি হলো সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করা এবং ডেমোক্রেটিক নিয়ন্ত্রণ। এই মডেলকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে প্রযুক্তিঘন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা তেমনই নতুন সম্ভাবনা "প্ল্যাটফর্ম সমবায়"; যা ইতোমধ্যে পৃথিবীর কিছুস্থানে প্রয়োগ হয়েছে তাই এই লেখায় তুলে ধরব:

## প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সমবায়

একে আধুনিক যুগের অংশীদারিত্বের নতুন সংজ্ঞা বলা যেতে পারে। উবার আমরা সকলে জানি, উবার একটি প্ল্যাটফর্ম, এর আয় থেকে লভ্যাংশ পায় চালকেরা, একটি গাড়ির মালিকানাও উবারের না থাকার পরও শুধুমাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা করে এর বাৎসরিক রেভিনিউ খুব বড় সংখ্যার। এটি একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবসা; তবে এর রেভিনিউ কর্পোরেট মালিকানা প্রতিষ্ঠানের পকেটে যায়। প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সমবায় হলো এরই অনুরূপ ব্যবসা মডেল, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতাকে সমবায়ের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে যুক্ত করে। এই মডেলে, প্ল্যাটফর্মের মালিকানা থাকে সকল সদস্যের হাতে। এর ফলে, ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধাগুলো

কিছু বৃহৎ কোম্পানির পকেটে না গিয়ে বরং সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে অর্থাৎ সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টিত হয়। প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সমবায়ের মূল লক্ষ্য হলো সদস্যদের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে প্রথাগত প্ল্যাটফর্মগুলোতে কর্মীরা প্রায়শই স্বল্প মজুরি এবং শোষণমূলক আচরণের শিকার হয়। স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা এই মডেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ মালিকানা সদস্যদের হাতে থাকায় প্ল্যাটফর্মে সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার ও গোপনীয়তা নিয়ে উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ থাকে। এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে, যেমন ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) এর মতো সমবায়গুলো তাদের আয়ের একটি অংশ স্থানীয় প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবেই, প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সমবায় একটি নৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম সমবায় গড়ে উঠছে যার মালিকানা উবারের মতো একক কোনো কর্পোরেটের না বরং সমবায়ের মতো অসংখ্য ব্যাক্তির। উদাহরণ হিসেবে Stocksy United Canada এবং ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) এর কথা বলা যায়।

## স্টকসি ইউনাইটেড

কানাডায় অবস্থিত স্টকসি ইউনাইটেড (Stocksy United) কেবল একটি সাধারণ স্টক ফটোগ্রাফি প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি শিল্প মালিকানার একটি নতুন এবং ন্যায্য সমবায় মডেল তৈরি করেছে। ২০১০ সালের দিকে যখন স্টক ফটোগ্রাফি শিল্পে ফটোর মূল্য কমে যাচ্ছিল, তখন আইস্টকফটো (iStockphoto) এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রুস লিভিংস্টোন এই মডেলের সূচনা করেন। তার লক্ষ্য ছিল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে শিল্পীরা তাদের সৃজনশীল কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবেন এবং তাদের কাজের মালিকানা ও সিদ্ধান্তের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০১২ সালে, যখন স্টক ফটোগ্রাফি মার্কেটপ্লেসগুলো ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঝুঁকছিল। এই সময় অনেক প্ল্যাটফর্মে ফটোর সংখ্যা বাড়লেও গুণগত মান কমছিল এবং শিল্পীরা তাদের কাজের জন্য খুব কম রয়্যালটি পাচ্ছিলেন। স্টকসি এই ধারার বিরুদ্ধে গিয়ে একটি কিউরেটেড প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি ছবি, ভিডিও বা ইলাস্ট্রেশন কঠোর মান যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল গুণগত মান বজায় রাখা এবং সদস্য শিল্পীদের সম্মানজনক পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা। প্ল্যাটফর্মের সাফল্য

সরাসরি এর শিল্পীদের সাফল্যের সাথে জড়িত থাকায় স্টকসি তার সদস্য শিল্পীদের জন্য উচ্চ রয়্যালটি দিয়ে থাকে। ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের থেকে রয়্যালটি বেশি হওয়ায় শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষা হয়। ব্যবস্থাপনা সমবায় মডেলে হওয়ায় এই সংগ্রহশালায় স্থান পাওয়া প্রতিটি ছবি, ভিডিও বা ইলাস্ট্রেশনকে একটি ডেডিকেটেড এডিটিং টিম পর্যালোচনা করে এবং উচ্চ মানদণ্ড পূরণ হলেই কেবল অনুমোদন দেয়। এই প্রক্রিয়াটি স্টকসির সংগ্রহকে বাজারের অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে আলাদা করে তোলে, যেখানে প্রায়শই বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের কনটেন্ট থাকে। প্ল্যাটফর্মটি এর সকল সদস্য শিল্পীর ফ্রিলান্সিং কাজকে ন্যায্য এবং টেকসই করেছে। স্টকসি ইন্ডাস্ট্রিতে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্ব করায় অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলোও তাদের শিল্পীদের পারিশ্রমিক এবং কর্মপরিবেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছে। স্টকসি-এর এই প্ল্যাটফর্ম সমবায় মডেলটি সমবায়জগতে একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ, যা প্রমাণ করে সমবায়ের মাধ্যমে যে একটি সুষ্ঠু এবং মানবিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা সম্ভব।

## ফেয়ার-বিএনবি

উবারের মতো আরেকটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম বিজনেস হলো Firbnb; এদেরও কোথাও একটি হোটেলও নেই, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হোটেল এরাই। এর অনুরূপ ইউরোপ-এ ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) নামে সমবায় প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য একই শুধু পরিচালনা সমবায় মডেলে। ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) একটি নৈতিক ও সমবায়ভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থা। পর্যটন শিল্প বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, গত কয়েক দশক ধরে এর বিস্তার, বিশেষ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে, শহর এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। Airbnb এর মতো বিরাট প্ল্যাটফর্ম এর আয় থেকে বড় অংশ চলে যায় এর কর্পোরেট মালিকানার কাছে, শুধু তাই নয় সময়ে সময়ে তারা ভাড়ার মূল্যবৃদ্ধি করে থাকে, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো। এরই প্রেক্ষিতে ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) এয়ারবিএনবি-এর মতো বৃহৎ প্ল্যাটফর্মগুলো জনপ্রিয়তা লাভের পর আবাসন সংকট, ভাড়ার মূল্যবৃদ্ধি এবং পর্যটন কেন্দ্রিক স্থানীয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসার মতো সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, ফেয়ারবিএনবি (Fairbnb.coop) নামের একটি নৈতিক ও সমবায়-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের জন্ম হয়। এটি শুধু একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ নয়, বরং একটি সামাজিক আন্দোলনও বটে।

২০১৬ সালে ইউরোপে এর যাত্রা শুরু হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল Airbnb এর বিকল্প হিসেবে একটি সমবায় মডেল তৈরি করা, যা প্রচলিত প্ল্যাটফর্মগুলোর বাণিজ্যিক মনোভাবের বিপরীতে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দেবে। ফেয়ার-বিএনবি (Fairbnb) বিশ্বাস করে যে, পর্যটনখাতের অর্থ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কর্পোরেট কোম্পানিরই নয়, স্থানীয়দের জন্যও ইতিবাচক হওয়া উচিত। তাই, এই প্ল্যাটফর্মটি সমবায় ব্যবসা মডেলে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে পর্যটকদের দেওয়া অর্থের একটি অংশ সরাসরি সামাজিক ও পরিবেশগত প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়। কার্যপদ্ধতিগত দিক থেকে সমবায় ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সহযোগিতামূলক কাঠামো, বহু-অংশীদারিত্ব, গণতান্ত্রিক মডেল, স্থানীয় অংশগ্রহণ, সততা ও স্বচ্ছতা। এই প্ল্যাটফর্মটি বুকিং-ফি থেকে যে কমিশন পায়, তার ৫০% স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ পরিবেশ সুরক্ষা, আবাসন উন্নয়ন, বা সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকল্পে খরচ করা হয়। অর্থাৎ এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বুকিং করলে একটি ভালো কাজে অংশগ্রহণ করা হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পর্যটনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ফেয়ারবিএনবি সাধারণত "এক হোস্ট, এক সম্পত্তি" নীতি অনুসরণ করে, শুধুমাত্র সদস্য স্থানীয় বাসিন্দা এবং নিজের প্রপার্টি ভাড়া দিচ্ছে এমন ক্ষেত্রেই লিস্টিং যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যিক স্বার্থের চেয়ে সমবায় দর্শন এখানে গুরুত্ব পায়। লিস্টিং এর সকল সদস্যকেই প্ল্যাটফর্মের নিয়মাবলি মেনে চলতে হয়। এই সকল বিষয়গুলোর জন্যেই ফেয়ারবিএনবি একটি প্ল্যাটফর্মের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; এটি একটি দর্শন, একটি আন্দোলন।

## এগ্রি-টেক কো-অপারেটিভ

কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ; এখন সময় এসেছে স্মার্ট কৃষির যুগে প্রবেশের। বিশ্বের অনেক দেশে কৃষকরা মিলে এখন "এগ্রি-টেক কো-অপারেটিভ" গঠন করছে, যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহার হয় সম্মিলিতভাবে। ভারতের কৃষি সমবায়গুলো এখন ড্রোন দিয়ে জমি পর্যবেক্ষণ করে, মাটির আর্দ্রতা মাপার জন্য আইওটি সেন্সর ব্যবহার করে এবং বাজারদর বিশ্লেষণে এআই সফটওয়্যার চালায়। ফলে উৎপাদন বাড়ছে, খরচ কমছে, আর কৃষকের আয় হচ্ছে স্থিতিশীল। দেশের মধ্যে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও নওগাঁ অঞ্চলে এখন ছোট পরিসরে ব্যক্তিগতভাবে স্মার্ট ফার্মিং প্রকল্প চলছে। যদি এই ধরনের উদ্যোগগুলো সমবায় কাঠামোয় আনা যায় তা এক নতুন যুগের সূচনা করবে। এটি শুধু কৃষি উৎপাদনে নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য হ্রাস ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে।

**প্রকৌশলী ফারহানা ফেরদৌসী:** জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ।

# বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার সমবায় ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এম. এম. মোর্শেদ

সমবায় হলো একটি গণতান্ত্রিক ও সদস্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটি বিশ্বজুড়ে টেকসই উন্নয়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। সমবায় হলো বিশ্বের অন্যতম পুরোনো ও পরীক্ষিত অর্থনৈতিক সংগঠন, যা পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (ICA)–এর তথ্যানুযায়ী, বিশ্বজুড়ে শতকোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। উন্নয়নশীল ও উন্নত উভয় ধরনের অর্থনীতিতেই সমবায় দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাজার ব্যর্থতা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এখানে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার সমবায় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ, কাঠামো, আইনগত ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তুললেও, উভয় দেশেই সমবায় একটি বিকল্প ও পরিপূরক অর্থনৈতিক কাঠামো হিসেবে কাজ করছে।

## ঐতিহাসিক বিকাশ

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে, ১৯০৪ সালের Co-operative Credit Societies Act–এর মাধ্যমে এর সূচনা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ কৃষকদের মহাজনী ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো। স্বাধীনতার পর সমবায়কে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৩৯ সালে, কৃষিপণ্যের মূল্য সংকটের প্রেক্ষাপটে। এটি মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সদস্যদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ও কার্যকর পরিপূরক কাঠামোতে রূপ নেয় আগামীতে। এই ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই পরবর্তীতে দুই দেশের সমবায় ব্যবস্থার কাঠামো ও পরিচালনায় মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে।

## সমবায়ের ধরন ও কাঠামো

বাংলাদেশে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত কৃষি, মৎস্য, তাঁত, শ্রমিক ও আবাসন খাতভিত্তিক। অধিকাংশ সমবায় গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ায় সমবায় কাঠামো অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। এখানে ভোক্তা-

মালিকানাধীন, শ্রমিক-মালিকানাধীন, উৎপাদক-মালিকানাধীন এবং উদ্যোগ-মালিকানাধীন সমবায়ের পাশাপাশি বহুস্বার্থসম্পন্ন (multi-stakeholder) সমবায়ও সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই বহুমুখিতা অস্ট্রেলিয়ার সমবায় খাতকে অর্থনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করে রেখেছে।

## শাসনব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে সমবায় ব্যবস্থা প্রধানত সমবায় অধিদপ্তর তথা সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সামাজিক উন্নয়নকেন্দ্রিক, যেখানে দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় সমবায়গুলো অনেকটাই বাজারমুখী, সদস্যনিয়ন্ত্রিত এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনাভিত্তিক, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও টেকসই করেছে। বাংলাদেশে অনেক সমবায় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। পেশাদার ব্যবস্থাপনার অভাব, দুর্বল জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি এসব সমবায়ের কার্যকারিতা কমিয়ে রেখেছে।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার সমবায়গুলো সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আধুনিক কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতিমালা অনুসরণ করে। নিয়মিত অডিট, স্বচ্ছ আর্থিক হিসাব এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এসব সমবায়ের ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে। এর ফলে সমবায়গুলো আরও কার্যকর, স্থিতিশীল ও টেকসই হয়েছে।

## আইনগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো

বাংলাদেশে সমবায়গুলো পরিচালিত হয় বাংলাদেশ সমবায় আইন, ২০০১ (সংশোধিত) অনুযায়ী। এখানে সমবায় অধিদপ্তর একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। তবে অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ ও ব্যুরোক্রেসির জটিলতার কারণে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধীর গতির হয়ে যায় এবং সমবায়গুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় যা নানা জটিলতার সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় Co-operatives National Law একটি আধুনিক, নমনীয় ও বিনিয়োগবান্ধব আইন কাঠামো প্রদান করে। সেখানে রাজ্যভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যা স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

## অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

সমবায় খাত বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষাপটে সমবায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করলে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশে সমবায়গুলোর সামাজিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ও বহুমাত্রিক। দারিদ্র্য হ্রাস, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য, সমবায় সমিতিভিত্তিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়তা করছে। নারীর অংশগ্রহণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতেও সমবায় একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। তবে এই উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবদান সত্ত্বেও সমবায়গুলোর অর্থনৈতিক অবদান সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ ও নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুতর সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অধিকাংশ সমবায়ের আর্থিক কার্যক্রম, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমূল্য সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় না, ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের প্রকৃত অবদান পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিফলিত হয় না।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় সমবায় ও মিউচুয়াল খাত একটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী খাত হিসেবে বিকশিত হয়েছে। দেশটির বড় সমবায় ও মিউচুয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকিং, বিমা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও খুচরা বাণিজ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব, মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হয়। এর ফলে নীতিনির্ধারকরা তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং সমবায় খাতের বিকাশে কার্যকর নীতি সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে সমবায়ের সামাজিক গুরুত্ব অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার হলেও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন দুর্বল, অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ায় সমবায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় অবদানই পরিমাপযোগ্য ও নীতিগতভাবে স্বীকৃত। এই তুলনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে সমবায় খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং অর্থনৈতিক অবদান পরিমাপের উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

## উপসংহার

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার সমবায় ব্যবস্থা ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতায় গড়ে উঠলেও উভয় দেশের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে সমবায় একটি কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেল। বাংলাদেশে সমবায় প্রধানত দারিদ্র্য হ্রাস, গ্রামীণ জীবিকায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে, অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ায় সমবায় ও মিউচুয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষি, ব্যাংকিং, বিমা, স্বাস্থ্য ও খুচরা বাণিজ্যের মতো মূলধারার খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অবদান রাখছে। অস্ট্রেলিয়ার সমবায়গুলো বাজারমুখী পরিচালনা, শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়ার সমবায় মডেল বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স ও শেখার ক্ষেত্র হতে পারে। বিশেষত সমবায়ের আর্থিক তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও প্রকাশ, গুরুত্বের সাথে পেশাদার ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা এবং নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এসব বিষয় বাংলাদেশের সমবায় খাতের কার্যকারিতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, সমবায় নীতি ও আইনি কাঠামো আধুনিকায়ন, সমবায় ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সদস্যদের প্রকৃত মালিকানা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় অবস্থান নিশ্চিত করা গেলে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের সমবায়গুলোকে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন যথা আইএসও- ৯০০১, বিএসসিআই এর আওতায় নিয়ে আসতে পারলে, বাংলাদেশে সমবায় খাত কেবল সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবেই নয়, বরং একটি শক্তিশালী, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

## তথ্যসূত্র


- Birchall, J. (2013). Resilience in a downturn: The power of financial cooperatives.
- Fairbairn, B. (2012). Co-operatives and the state.
- ICA (2021). Facts and Figures on Co-operatives.
- Snaith, I. (2017). Co-operative Capital Units in Australia.


- Acknowledged and thanks to Mr. Antony McMullen, FGIA, an Australian Cooperator, who offered some assistance with this article for Australia Cooperative.



**এম. এম. মোর্শেদ :** সিনিয়র ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স (বিভাগীয় প্রধান), ইন্টারটেক বাংলাদেশ, সাবেক কোঅর্ডিনেটর, INTERCOOP- বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান

## ঋণ: সমৃদ্ধির সোপান নাকি দাসত্বের শিকল?

# ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি সদস্য ও সমবায় সমিতির করণীয়

সৈয়দ জসীম উদ্দিন

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঋণ একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ বা সামাজিক উন্নয়ন সবকিছুতেই ঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে, ঋণের সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে এটি আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ঋণ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ঋণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়, সঠিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির একটি বড় অংশ সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যক্তি সদস্য এবং সমবায় সমিতি উভয় ক্ষেত্রেই টেকসই আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমানে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, কনজিউমারিজমের প্রভাবে মন্দ ঋণের প্রসার ঘটছে। এই প্রবন্ধে আমরা ভালো ও মন্দ ঋণের পার্থক্য, কনজিউমারিজমের ভূমিকা, ব্যক্তিগত ও সমবায় সমিতির ঋণ ব্যবস্থাপনার করণীয় এবং চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। উদ্দেশ্য হলো সমবায় সমিতি ও সমবায় সদস্যদের সচেতন করে তোলা, যাতে ঋণ হয় উন্নয়নের সোপান, না হয় দাসত্বের শিকল।

## ভালো ঋণ বনাম মন্দ ঋণ

সব ঋণ সমান নয়। ঋণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের ভিত্তিতে একে 'ভালো ঋণ' (Good Debt) এবং 'মন্দ ঋণ' (Bad Debt) এ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভালো ঋণ হলো এমন বিনিয়োগ যা ভবিষ্যতে নিট সম্পদ বৃদ্ধি করে বা নিয়মিত আয় তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা ঋণ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পাওয়া যায়, যা আয় বাড়ায়। অন্যদিকে, মন্দ ঋণ হলো এমন ঋণ যা দ্রুত মূল্যহ্রাসপ্রাপ্ত জিনিসের জন্য নেওয়া হয় এবং কোনো আর্থিক রিটার্ন দেয় না।

## ভালো ঋণের বৈশিষ্ট্য

- **সম্পদ বৃদ্ধি:** সময়ের সাথে মূল্য বাড়ে, যেমন জমি বা বাড়ি কেনার জন্য ঋণ।
- **আয় বৃদ্ধি:** ব্যবসায়িক ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তা থেকে লাভ

## ভালো ও মন্দ ঋণের তুলনামূলক পার্থক্য

| বৈশিষ্ট্য | ভালো ঋণ (Good Debt) | মন্দ ঋণ (Bad Debt) |
|---|---|---|
| উদ্দেশ্য | সম্পদ সৃষ্টি বা আয় বৃদ্ধি | ভোগ-বিলাস বা দ্রুত মূল্য হ্রাস পায় এমন বস্তু ক্রয় |
| ভবিষ্যৎ মূল্য | বৃদ্ধি পায় | হ্রাস পায় বা নিঃশেষ হয়ে যায় |
| সুদের/সার্ভিস চার্জের হার | সাধারণত কম | সাধারণত অনেক বেশি |
| আর্থিক প্রভাব | নিট সম্পদ বাড়ায় | আর্থিক বোঝা তৈরি করে |
| উদাহরণ | শিক্ষা, বাড়ি, ব্যবসা | ক্রেডিট কার্ড, দামি গ্যাজেট, ভ্রমণ |

হয়।

- **কম সুদের হার:** সমবায় সমিতি বা ব্যাংক থেকে নেওয়া হলে সুদ কম, অন্যদিকে অপ্রচলিত খাত হতে ঋণ নিলে সুদের হার অনেক বেশি

### মন্দ ঋণের বৈশিষ্ট্য

- **মূল্য হ্রাস:** কেনা জিনিসের মূল্য কমে, যেমন দামি ফোন, মোটরসাইকেল।
- **উচ্চ সুদ:** ক্রেডিট কার্ডে সুদ ২০-৩০% হতে পারে।
- **আর্থিক বোঝা:** আয় তৈরি না করে খরচ বাড়ায়।
- **মানসিক চাপ:** ঋণের জালে আটকে পড়া।

ঋণ নেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন: “এই ঋণ কি ভবিষ্যৎ আয় বাড়াবে, নাকি শুধু বর্তমান খরচ মেটাবে?” যদি আয় বাড়ায়, তবে ভালো; অন্যথায় এড়িয়ে চলুন।

### কনজিউমারিজম: মন্দ ঋণের মূল কারণ

কনজিউমারিজম হলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার মানসিকতা, যা “দেখে দেখে” কেনার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত। বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইনফ্লুয়েন্সাররা “Buy Now, Pay Later” স্লোগান দিয়ে প্রয়োজন তৈরি করে। ফলে মানুষ মন্দ ঋণের ফাঁদে পড়ে।

### বাংলাদেশে কনজিউমারিজমের বাস্তব ছবি

- মাসে মাসে স্মার্টফোন পরিবর্তনের প্রতিযোগিতা।
- ইনস্টলমেন্টে মোটরবাইক ক্রয়, যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে বিলাসিতা মুখ্য।
- কিস্তিতে হোম অ্যাপ্লায়েন্স কেনা, যেমন অতিরিক্ত ফ্রিজ বা টিভি।
- ফুড ডেলিভারিতে অপ্রয়োজনীয় খরচ।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় “লাইফস্টাইল” দেখানোর চাপে দামি পোশাক কেনা।
- রিটার্ন ক্যাশ ফ্লো বিবেচনা না করে বাড়ি বা ফ্লাট ক্রয়।

কনজিউমারিজম এর সাথে যখন ঋণের ফাঁদ যুক্ত হয় তখনই আর্থিক দাসত্ব তৈরি হয়। এটি তিন ধাপে ঘটে:

- **আকর্ষণ:** “না কিনলে পিছিয়ে পড়বো” ভয় থেকে ক্রয়।
- **ঋণ নেওয়া:** তাৎক্ষণিক আনন্দের জন্য ভবিষ্যৎ আয় বন্ধক রাখা।
- **কিস্তির চাপ:** স্বাধীনতা হারানো, যেমন চাকরি পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে না পারা।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ড ঋণ ২০২৫ সালে ২০% বেড়েছে, যার বেশিরভাগ কনজিউমারিজম সম্পর্কিত । এটি মোকাবিলায় আর্থিক শিক্ষা প্রয়োজন।

### ব্যক্তিগত ঋণ ব্যবস্থাপনায় করণীয়

ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণের বোঝা অনেক সময় মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একজন ব্যক্তির জন্য ঋণ গ্রহণের আগে ও পরে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি:

১. **প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য যাচাই:** ঋণ গ্রহণের আগে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে এই ঋণ কি সত্যিই অপরিহার্য? বিলাসিতা বা অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ গ্রহণ এড়িয়ে চলা উচিত। কেবল আয়বর্ধক কাজে বা জরুরি প্রয়োজনে ঋণ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

২. **পরিশোধ সক্ষমতা নির্ধারণ:** ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব কি–না, তা আগেই হিসাব করতে হবে। মাসিক আয়ের ২০-৩০ শতাংশের বেশি ঋণের কিস্তি হওয়া উচিত নয়।

৩. **সঠিক উৎস নির্বাচন:** অনানুষ্ঠানিক উৎস বা চড়া সুদের মহাজনী ঋণ এড়িয়ে চলা উচিত। সরকারি তহবিল, ব্যাংক বা নিবন্ধিত সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিলে সুদের/সার্ভিস চার্জের হার তুলনামূলক কম থাকে এবং আইনি সুরক্ষা পাওয়া যায়।

৪. **বাজেট ও আর্থিক শৃঙ্খলা:** ঋণ গ্রহণের পর একটি কঠোর বাজেট অনুসরণ করা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কিস্তি খেলাপি হলে দণ্ড সুদ বা জরিমানার কারণে ঋণের বোঝা আরও বেড়ে যায়।

৫. **জরুরি তহবিল গঠন:** ঋণের কিস্তি চলাকালীন আকস্মিক কোনো বিপদ (যেমন- চাকরি পরিবর্তন/হারানো বা অসুস্থতা) মোকাবিলা করার জন্য একটি ছোট জরুরি তহবিল থাকা প্রয়োজন, যাতে ঋণের কিস্তি বন্ধ না হয়।

৬. **সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ঋণ পরিশোধ:** বিচ্ছিন্ন এবং খেয়াল খুশিমতো না করে ঋণ পরিশোধের জন্য একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে তুষার গোলক ও তুষার ধস (Debt snowball and Avalanche) পদ্ধতি

আধুনিক অর্থ ব্যবস্থাপনায় ঋণ পরিশোধের জন্য দুটি বহুল ব্যবহৃত ও কার্যকর কৌশল হলো তুষার গোলক এবং তুষার ধস পদ্ধতি। এই প্রবন্ধে উভয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা, উদাহরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

### ১. তুষার গোলক পদ্ধতি

ডেবট স্নোবল পদ্ধতি একটি **আচরণভিত্তিক (Behavioral)** ঋণ পরিশোধ কৌশল। এই পদ্ধতিতে ঋণগুলোকে সুদের হার বিবেচনা না করে **ছোট থেকে বড় অঙ্ক অনুযায়ী** সাজানো হয়। প্রথমে সবচেয়ে ছোট ঋণটি সম্পূর্ণ পরিশোধে মনোযোগ দেওয়া হয়।

### পদ্ধতির ধাপসমূহ

- সব ঋণের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা
- ঋণগুলো পরিমাণ অনুযায়ী ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজানো
- সব ঋণে ন্যূনতম কিস্তি পরিশোধ

চালু রাখা

- সবচেয়ে ছোট ঋণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা
- একটি ঋণ পরিশোধ হলে সেই কিস্তির অর্থ পরবর্তী ঋণে যোগ করা

উদাহরণ: ধরুন আপনার ৩টি ঋণ আছে, ঋণ (ক) ৫০,০০০ টাকা, ঋণ (খ) :১,০০,০০০ টাকা, ঋণ (গ): ২,০০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে দ্রুত ঋণ (ক) পরিশোধ করতে হবে।

তুষার গোলক পদ্ধতির সুবিধা: এ পদ্ধতিতে ছোট ঋণ পরিশোধের সাথে সাথে দ্রুত সাফল্যের অনুভূতি দেয় এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা তৈরি করে। এতে ঋণ পরিশোধে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

## ২. তুষার ধস পদ্ধতি

ডেবট অ্যাভালান্স পদ্ধতি একটি **গাণিতিক ও আর্থিকভাবে দক্ষ** কৌশল। এখানে ঋণগুলোকে **সুদের হার অনুযায়ী বেশি থেকে কম** সাজানো হয় এবং সবচেয়ে বেশি সুদযুক্ত ঋণ আগে পরিশোধ করা হয়।

### পদ্ধতির ধাপসমূহ

- সব ঋণের তালিকা প্রস্তুত করা
- সুদের হার অনুযায়ী ঋণ সাজানো
- সব ঋণে ন্যূনতম কিস্তি প্রদান করা
- সর্বোচ্চ সুদের ঋণে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া
- ধাপে ধাপে সব ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন করা

উদাহরণ: ধরুন আপনার ৩টি ঋণ আছে, ঋণ (ক) ২০% সুদ, ঋণ (খ) :১২% সুদ, ঋণ (গ): ৮% সুদ। এক্ষেত্রে সুদ বেশি থাকায় দ্রুত ঋণ (ক) পরিশোধ করা হবে।

তুষার ধস পদ্ধতির সুবিধা: মোট সুদের ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এবং আর্থিকভাবে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

## তুষার গোলক ও তুষার ধস পদ্ধতি, কোনোটি আপনার জন্য?

তুষার গোলক পদ্ধতি মূলত মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণার ওপর গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে তুষার ধস পদ্ধতি সুদের খরচ কমানোর মাধ্যমে আর্থিক দক্ষতা নিশ্চিত করে। যারা সহজে অনুপ্রেরণা হারান, তাদের জন্য তুষার গোলক পদ্ধতি উপযোগী। আর যারা আর্থিক শৃঙ্খলায় দৃঢ়, তাদের জন্য তুষার ধস পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

সমবায় সমিতির ঋণ ব্যবস্থাপনায় করণীয়

বর্তমানে অধিকাংশ সমবায় সমিতির মূল চালিকাশক্তি হলো এর ঋণ কার্যক্রম। এজন্য সমবায় সমিতির জন্য কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। সমবায় সমিতির ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

**১. ঋণ নীতিমালা** : প্রত্যেক সমবায়ের একটি স্বচ্ছ 'ঋণ নীতিমালা' **(Loan Policy)** থাকা উচিত। ঋণ নীতিমালা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হবে এবং এই নীতিমালা সকল সদস্যের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

**২. সদস্যপদ ও শেয়ারের শর্ত**

**সদস্যপদ:** সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৬(ক)(১) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য হতে হবে ।

**শেয়ারের অনুপাত:** সদস্যকে তার প্রস্তাবিত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশের (সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪ এর ৭৪ বিধি অনুসারে কমপক্ষে ৪০ ভাগের ১ ভাগ) সমপরিমাণ শেয়ার এবং পর্যাপ্ত সঞ্চয় সমিতিতে জমা রাখতে হয়। এটি ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

**সঞ্চয়ের ইতিহাস:** ঋণগ্রহীতার নিয়মিত সঞ্চয় জমা দেওয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করা উচিত, যা তার আর্থিক শৃঙ্খলা ও পরিশোধের সক্ষমতা নির্দেশ করে।

## ৩. ঋণের উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ

ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য অবশ্যই সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বা উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

**উৎপাদনশীল ঋণ (Productive Loan):** কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পশুপালন, বা কুটির শিল্পের জন্য প্রদত্ত ঋণ। এই ধরনের

## ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরি প্রক্রিয়ার কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে:

| ধাপ | কার্যক্রম | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| **১. আবেদন গ্রহণ** | সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৭০(১) বিধি মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন এবং ৭০(৩) বিধি অনুযায়ী তার সম্পত্তি, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিমাণ ও পরিশোধের সময় উল্লেখ করে আবেদন জমা দিবেন। | ঋণের আনুষ্ঠানিক সূচনা। |
| **২. যাচাই-বাছাই** | ঋণ উপ-কমিটি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, ঋণের উদ্দেশ্য এবং পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করবেন। ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য এবং জামানতের পরিমাণ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৭০(৫) বিধি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। | ঋণের ঝুঁকি মূল্যায়ন। |
| **৩.জামানত/নিরাপত্তা** | সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৭২ বিধি অনুযায়ী সমিতির উপআইনে জামানতের বিষয়ে বিধান রাখার জন্য বলা হয়েছে। সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ডের ধরন বিবেচনা করে উপযুক্ত জামানতের পাশাপাশি অন্য দুইজন সক্রিয় সদস্যকে **জামিনদার (Guarantor)** হিসেবে নিতে পারে। | ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। |
| **৪. ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন** | বড় সমিতির ক্ষেত্রে ঋণ কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি পৃথক ঋণ উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি ঋণের আবেদন যাচাই এবং বিতরণের সুপারিশ করবে। ঋণ উপ-কমিটি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা মোতাবেক আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি সভার মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও পরিশোধের সময়সূচি চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে। | আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা প্রদান। |
| **৫. চুক্তি সম্পাদন** | ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের সাথে সমিতির একটি আনুষ্ঠানিক **ঋণ চুক্তি (Loan Agreement)** স্বাক্ষর করতে হবে। | শর্তাবলি লিখিতভাবে নিশ্চিত করা। |

## খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো নিম্নরূপ:

| ধাপ | কার্যক্রম | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| **১. প্রাথমিক যোগাযোগ** | কিস্তি খেলাপি হওয়ার সাথে সাথে সদস্যের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে কারণ জানতে চাওয়া এবং পরিশোধের জন্য উৎসাহিত করা। | সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও দ্রুত সমাধান। |
| **২. আনুষ্ঠানিক নোটিশ** | নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধের জন্য **আনুষ্ঠানিক নোটিশ** প্রদান করা। | আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার প্রস্তুতি। |
| **৩. জামিনদারের সাথে যোগাযোগ** | ঋণ পরিশোধের জন্য জামিনদারদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। | বিকল্প উপায়ে ঋণ আদায়। |
| **৪. সঞ্চয়/শেয়ার সমন্বয়** | সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী, খেলাপি সদস্যের/জামিনদারের সঞ্চয় বা শেয়ারের অর্থ ঋণের বিপরীতে সমন্বয় করা। | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবহার। |
| **৫. আইনি পদক্ষেপ** | যদি অন্য কোনো উপায়ে ঋণ আদায় সম্ভব না হয়, তবে সমবায় আইন, ২০০১ এর ৫০ ধারায় বিরোধ মামলা দায়ের বা ৮১ ধারায় নিবন্ধক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করা। | চূড়ান্ত আইনি প্রতিকার। |

ঋণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

**অনুৎপাদনশীল/ভোগ্য ঋণ:** চিকিৎসা, শিক্ষা বা জরুরি পারিবারিক ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত ঋণ। এই ঋণের পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত।

## ৪. ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরি প্রক্রিয়া

একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া সমিতির আর্থিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

## ৫. ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

ঋণের অর্থ সরাসরি নগদ না দিয়ে **ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে** প্রদান করা উত্তম।

ঋণ বিতরণের আগে ঋণের কিস্তি, সুদের হার এবং খেলাপি হলে করণীয় সম্পর্কে সদস্যকে স্পষ্টভাবে অবহিত করতে হবে।

সমবায় সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঋণ গ্রহীতাকে টেক্সট ম্যাসেজ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা।

## ৬. তদারকি

ঋণগ্রহীতা যেন ঋণের অর্থ প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে, তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত তদারকি প্রয়োজন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ঋণ উপ-কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।

উৎপাদনশীল ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবহার সঠিক পথে থাকলে পরবর্তী কিস্তি ছাড় করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

## ৭. ঋণ আদায় পদ্ধতি

**নিয়মিত কিস্তি:** ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা যেতে পারে। কিস্তি আদায়ের তারিখ ও পরিমাণ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

**প্রেরণা ও শাস্তি:** সময়মতো কিস্তি পরিশোধকারী সদস্যদের জন্য প্রণোদনা বা সুদের হারে ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে অন্যদিকে, ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি থাকতে হবে

অনিয়ম প্রতিরোধ: নিয়মিতভাবে গ্রাহকের পাশবহি পরীক্ষা করা যাতে আদায়কারী কর্তৃক কোনো অনিয়ম সংঘটিত না হয়।

কাগুজে লেনদেন পরিহার: ঋণ আদায়ের হার বাড়িয়ে দেখানোর জন্য কাগুজে লেন-দেন বা রিসিডিউলিং পরিহার করতে হবে।

## ৮. খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা

কোনো সদস্য কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে **খেলাপি সদস্য** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

## ৯. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা

সমিতির আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

**ঋণ সীমা নির্ধারণ:** কোনো একক সদস্যকে সমিতির মোট মূলধনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের বেশি ঋণ দেওয়া উচিত নয়।

সমবায় সমিতি আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী, সমিতির নিট মুনাফার ১০% **কু-ঋণ** হিসেবে রাখতে হয়। এই তহবিল খেলাপি ঋণের ক্ষতিপূরণে কিছুটা সাহায্য করে। তবে সমবায় সমিতির খেলাপি বেশি থাকলে সমবায় সমিতি বিধিমালার ৮১(ঘ) বিধি অনুযায়ী নিট মুনাফা নির্ণয় করার পূর্বেই কুঋণ খাতে অতিরিক্ত তহবিল সৃষ্টি করা যেতে পারে।

**নিয়মিত অডিট:** সমিতির আর্থিক লেনদেন এবং ঋণ কার্যক্রমের উপর নিয়মিত **অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ অডিট** নিশ্চিত করা।

সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার জমা প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সমিতির নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি পায় এবং আমানতের ওপর নির্ভরতা কমে।

## ঋণ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ সুদের হার, আর্থিক শিক্ষার অভাব এবং ঋণ খেলাপির সংস্কৃতি। ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে কিস্তি আদায় এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করলে জালিয়াতির সুযোগ কমে এবং ব্যবস্থাপনায় গতি আনা সম্ভব।

## উপসংহার

ঋণ ব্যবস্থাপনা কেবল গাণিতিক হিসাব নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল জীবনদর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অংশ। ব্যক্তি যদি সচেতনভাবে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করেন এবং সমবায় সমিতি যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তবে ঋণ হবে উন্নয়নের সোপান। সঠিক ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই দারিদ্র্য বিমোচন এবং একটি সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর সমাজ গঠন করা সম্ভব।

**সৈয়দ জসীম উদ্দিন:** এমবিএ (ফাইন্যান্স), পিজিডি (ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স), জেলা সমবায় কর্মকর্তা, খুলনা

# সমবায় মালিকানায় অনাবাদি জমি চা-চাষে সমবায়ীরা স্বাবলম্বী

মোঃ সাইফুল ইসলাম

তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহাকুমার চরাঞ্চলে প্রতি বছর বন্যা দেখা দিত। বন্যায় প্লাবিত হয়ে মানুষের ঘর–বাড়ি, জমির ফসল, হালের বলদ, দুধের গাভি, গরু, ছাগল ও গৃহপালিত হাঁস-মুরগি সব হারিয়ে প্রান্তিক কৃষক নিঃস্ব হয়ে যেত। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে বন্যায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আব্দুল মন্ডল ও তার এলাকার ২০/২৫ জন ভিটেমাটি ছেড়ে বসবাসের জন্য উঁচু জায়গার খোঁজে বের হন। লোকমুখে অনাবাদি জায়গার খবর শুনে ও সরেজমিনে তখনকার দিনাজপুর বর্তমানের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় গিয়ে ওঠেন। ভিটেমাটি হারা, সহায়-সম্বলহীন এসব মানুষ প্রথমে অন্যের জমি চাষাবাদ ও কাজকর্ম করা শুরু করে। কম জনবসতিপূর্ণ তেঁতুলিয়ায় তখন অনেক জমি অনাবাদি পড়ে ছিল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও ছিল। এখানে প্রতিকূল অবস্থা থাকলেও বন্যার মহামারি ফসলহানি হয়ে নিঃস্ব হওয়া থেকে হিংস্র জীবজন্তুর সাথে থাকা শ্রেয় মনে করে গৃহহারা এসব মানুষ উঁচু ভূমি তেঁতুলিয়াতে বসতি স্থাপন শুরু করে। প্রথমদিকে এই জমিতে ধান, পাট ও আখ চাষ করা হলেও তা তাদের জীবিকানির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

## কৃষকদের নামে সরকারি জমির বন্দোবস্ত

তেঁতুলিয়ার অনাবাদি কৃষিজমি মাইগ্রেশন করা গৃহহীন, ভূমিহীন এসব কৃষকের প্রত্যেককে পাঁচ একর করে ভূমি সরকার বন্দোবস্ত দেয়। ১৯৬২ সালে সরকার জানায় সরকারি জমি বন্দোবস্ত নিতে হলে খাজনা দিতে হবে। তখন একর প্রতি ২৫০ টাকা সালামি নির্ধারণ করা হয়। একজন

কৃষককে তার নামে বরাদ্দকৃত ৫ একর জমির জন্য প্রতি একর ২৫০ টাকা হারে ১২৫০ টাকা সালামি নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর্থিক অনটনের কারণে কৃষকরা সালামির সমুদয় টাকা দিতে না পারায় সরকার পত্তন বাতিল করে দেয়।

## সমবায় সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

তেঁতুলিয়া উপজেলার সীমান্তঘেঁষা মাঝিপাড়া গ্রাম একসময় কর্মসংস্থানের অভাবে ব্যাপক দারিদ্র্যপীড়িত ছিল। জীবিকার অভাবে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করতো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এসব জমি কৃষকদের দখলে ছিল। পত্তন বাতিল হওয়ার পর কৃষকগণ সরকারের নিকট পুনরায় জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এডিসি রেভিনিউ তাদেরকে বলেন যে, পাকিস্তান সরকার ৫ একর করে জমি বন্দোবস্ত দিয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে দেড় একরের বেশি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে আপনারা সমবায় সমিতি গঠন করে আসলে সমবায় সদস্যদের নামে চাহিদা অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে 'মাঝি পাড়া কৃষি খামার সমবায় সমিতি' গঠন করা হয়। কৃষকগণের মধ্যে হতে প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিকভাবে ২৫/৩০ জন কৃষক এ সমিতির সদস্য হন। সমিতির বর্তমান সম্পাদক জনাব মোঃ আবুল হোসেনও এ সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি অল্প বয়সে তার বাবার সাথে এ সমিতির সদস্য হন। কৃষক আব্দুল মন্ডলের ছেলে আবুল হোসেনের বয়স তখন ৮ বছর। আবুল হোসেন বাবার সাথে সরকারি জমিতে কৃষিকাজ করতেন।

> চা বাগান করলে কাঁচা চা-পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ না করেই স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করা যায়, যা তাদের পেশা কৃষিকাজের চেয়ে চা-বাগান সৃজন করা অনেক লাভজনক-এ বিবেচনায় তারা চা-বাগান সৃজনে উদ্বুদ্ধ হন ।

## 'মাঝি পাড়া কৃষি খামার সমবায় সমিতি'র সদস্যদের নামে জমি বন্দোবস্ত

সমবায় সমিতি গঠন করার পর সদস্যরা জমি বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। সমিতির সদস্যরা সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালে দিনাজপুর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলা নং ৯২/৭৭। মামলা চলাকালীন দিনাজপুর জেলা ভাগ হয়ে যায়। মামলায় ১৯৮১ সালে সমিতির পক্ষে রায় হয়। সরকার এ রায় না মেনে তেঁতুলিয়া পঞ্চগড় জেলার অধীনে বলে পঞ্চগড় জেলা জজ কোর্টে সরকার আপিল দায়ের করে। জেলা জজ সমিতির পক্ষে রায় দেয়। সরকার এ রায় না মেনে রংপুর হাইকোর্টে আপিল দায়ের করে। হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন সমবায় সমিতির সদস্যগণ সিও রেভিনিউ এর নিকট মামলার বিষয় তদন্তের জন্য অনুরোধ করেন। সিও রেভিনিউ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্তের আদেশ দিলে তার তদন্তে সমবায় সমিতির সদস্যরা যে ভূমিহীন তা প্রমাণিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায়ীদের পক্ষে হাইকোর্টে লেখালেখি করে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য পত্র দেয়। ১৯৯৩ সালে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় 'মাঝি পাড়া কৃষি খামার সমবায় সমিতি'র সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬ জনে। সরকার সমবায় সমিতির ৫৬ জন সদস্যের প্রত্যেককে একর প্রতি ২৫০ টাকা এককালীন সালামির বিনিময়ে প্রতিজনকে ৫ একর করে মোট ২৪৫ একর জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত জমিতে সমবায় সদস্যগণ কৃষিকাজ করিতেছিলেন।

## সমবায় চা-বাগান সৃজন

২০১২ সালে সমিতি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় "অনাবাদি জমিতে চা চাষের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন"। সদস্যরা সমবায় বিভাগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় ২০০ একর জমিতে সমবায় চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে। আজ এটি দৃশ্যমান ও সমৃদ্ধ একটি বাগান, যা কেবল উৎপাদন বাড়ায়নি, বরং সমিতিকে নতুন অর্থনৈতিক দিগন্তে নিয়ে গেছে।

## চা-চাষে সমিতির নাম পরিবর্তন

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সীমান্তঘেঁষা পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা। নব্বই দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা উদ্যোক্তা শিল্পপতি সীমান্ত এলাকার পার্শ্ববর্তী ভারতের চা-বাগানের অভিজ্ঞতার আলোকে তেঁতুলিয়ায় চা বাগান করা শুরু করেন। তিনি চা বাগানের পাশাপাশি চা-প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরিও নির্মাণ করেন। তারই ফ্যাক্টরিতে মাঝিপাড়া কৃষি খামার সমবায় সমিতির সদস্যরা চা-চারা তৈরি ও ফ্যাক্টরিতে কাজকর্ম করতে থাকে। এ কাজে তাদেরকে ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এ সমবায় সমিতির সদস্যরা চা বাগানে কাজ করার সময় দেখলো যে অন্য কৃষিকাজের চেয়ে চা-বাগান করা লাভজনক। চা-চাষে একদিকে যেমন চা বাগানের মালিক হওয়া যায়, অন্যদিকে চা ফ্যাক্টরিতেও চা-পাতা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। অর্থাৎ চা বাগান করলে কাঁচা চা-পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ না করেই স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করা যায়, যা তাদের পেশা কৃষিকাজের চেয়ে চা-বাগান সৃজন করা অনেক লাভজনক- এ বিবেচনায় তারা চা-বাগান সৃজনে উদ্বুদ্ধ হন এবং চা-চারা উৎপাদন করে বাগান তৈরিতে মনোনিবেশ করে। এ পর্যায়ে তারা সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ' করে। বর্তমানে এ সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯৮ জন।

## চা-বাগানের পরিচর্যা, উৎপাদন ও বিপণন

চা-বাগানে একবার চা গাছ রোপণ করলে ১০০ বছর পর্যন্ত বাগান চলমান থাকে, শুধুমাত্র ঔষধ এবং বাগানের পরিচর্যা করতে হয়। ধান চাষে একর প্রতি আট দশ মন ফলন হতো, এ ধান বিক্রি করে ৪ হাজার টাকা পাওয়া যেত, সারা বছর এক দুইবার ধানের ফলন হতো, বেশিরভাগ কৃষিজমি অনাবাদি,পতিত পড়ে থাকতো। চা বাগান তৈরির পর প্রতি একরে এক রাউন্ডে অর্থাৎ ৪৫ দিন পর ২০০০ কেজি কাঁচা চা পাতা পাওয়া যায়। প্রতি কেজি কাঁচা চা পাতা ২০-২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। এতে একর প্রতি বছরে তিন লাখ টাকা উপার্জন হয়। এখানে একজন সদস্যর সর্বনিম্ন ৫০ শতক থেকে শুরু করে পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা রয়েছে।

## মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা চাষি সমবায় সমিতি লিঃ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণে সাফল্য অর্জন করেছে

### চা-বাগানে জীবন জীবিকার আমূল পরিবর্তন

পঞ্চগড় জেলার সমতলভূমিতে চা চাষের প্রসার সমবায় কার্যক্রমকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সফল একটি সমবায় সমিতির নাম 'মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ'। এ সমিতির সদস্যরা চা-চাষ করে চা-পাতা উৎপাদন ও তা বিক্রি করে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা আয় করছে। চা-বাগানে ৪৫০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। সমবায়ীরা চা-চাষ করায় ক) সদস্যদের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, খ) নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, গ) গ্রামীণ বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, ঘ) কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্পকারখানামুখী কার্যক্রমের প্রসার লাভ করায় স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত জমির মধ্যে চা-বাগান তৈরির পর অবশিষ্ট জমিতে সমিতির অফিস ঘর, সদস্যদের বাড়ি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়েছে।

সমবায় সমিতির প্রায় ১০০ জনের অধিক সদস্য সরকার কর্তৃক তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া জমিতে একাংশে বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন, অন্য দিকে সদস্যদের প্রত্যেকের বাড়িতেই গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি লালনপালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। সমিতি এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করে মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছে ও ছেলেমেয়েরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে শিক্ষিত হচ্ছে। সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় তা প্রত্যক্ষ অনুধাবন করা যায়।

নিজস্ব জমিতে অফিস ঘর নির্মাণ করে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। নিজস্ব জমিতে চা বাগান করার পূর্বে সমিতির সদস্যরা এখানে ছনের চালা ও পাটকাঠির তৈরি বেড়া দিয়ে নির্মিত ঘরে বসবাস করতেন। বর্তমানে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে- দোতলা বিল্ডিং, পাকা দেয়ালের টিনের চালার ঘরে বসবাস করছেন।

### সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও সমবায় আইন, বিধি প্রতিপালন

সমিতি এলাকায় গ্রামের মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে সমিতির কার্যালয়ে বসে সমাধান করা হয়। এছাড়া এ সমিতি সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন/ অনুসরণ করে থাকে, যা সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

### প্রশিক্ষণ

সমিতির সদস্যরা চা-চাষ ছাড়াও হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ, মৎস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, রংপুর, ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন। এর ফলে সদস্যরা দক্ষতা অর্জন করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন।

### সামাজিক কর্মসূচি

সমিতি শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে কাজ করছে না, বরং এ সমিতির কার্যক্রমের বাহিরে নানামুখী সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে-স্থানীয় সড়ক উন্নয়ন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অসহায় পরিবারের মেয়েদের বিবাহে সহায়তা, চিকিৎসা ও মানবিক সাহায্য প্রদান, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও টিকাদান কর্মসূচি, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি। এসব কার্যক্রম সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

### আর্থিক কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করে মূলধন সৃষ্টি করা। গঠিত মূলধন দিয়ে সমবায় চা বাগানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সভ্যগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯৬ জন এবং চা-চাষ করে এই ৯৬ জন সদস্যের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। সমিতির শেয়ার মূলধন এর পরিমাণ ২,৫৬,৩৮০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ২,৬৬,৫৭৫ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৮৪,৩৪৮.৪৬ টাকা। সমিতির মূলধনের পরিমাণ ৯,১৪,৮৪২.৩৭ টাকা।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতি আগামী দিনে বৃহত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো একটি আধুনিক চা-প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন। সমিতির সদস্যগণ চা প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপনে সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে আরো ১০০ জনের স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সদস্যদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি;ভবিষ্যতে সমিতির নিজস্ব জায়গায় স্কুল/কলেজ/ হাসপাতাল, আবাসিক হোটেলসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সমিতির কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন মডেল হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা।

'মাঝি পাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ' এর সদস্যরা চা-চাষের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, যুগ্মনিবন্ধক, উপনিবন্ধকসহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমিতির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যতে এই সমিতি আরও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে-মর্মে সকলেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০২২ ও ২০২৩ এ কৃষি ক্যাটাগরিতে রংপুর বিভাগের মধ্যে এ সমিতি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সমিতির সদস্যরা শ্রম, মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে 'মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা চাষি সমবায় সমিতি লিঃ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণে সাফল্য অর্জন করেছে তা সারাদেশের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

**মোঃ সাইফুল ইসলাম:** সহকারী নিবন্ধক (পিপি), সমবায় অধিদপ্তর।

# সমবায়ে পথযাত্রা সৎ, যোগ্য উদ্যোক্তা

## আব্দুল ওয়াদুদ রতন

একজন গরিব রিকশা চালক সারাদিন পরিশ্রম করে ৫-৭ শত টাকা রোজগার করে হাতে নিয়ে বলে ধন্যবাদ এই দেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে। এই সমাজ আমাকে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে রাতের অন্ধকারে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে একটি বেকার ছেলে ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে গালি দেয়, ঠিক একই সময়ে এই দেশের অন্য প্রান্তে একটি ছেলে সিগারেটের কোম্পানির সেলসম্যান হিসাবে শরীরের ঘাম ঝরাচ্ছে, প্রশ্নের বিপরীতে তার জবাব পরিশ্রমই আমার বেকারত্বের মুক্তি দিয়েছে।

নিষ্ঠুর সকালে কোনো এক কোটিপতির সন্তান মাকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে শহরের অন্য প্রান্তে কোনো এক গরিব ছেলে তার মায়ের মুখে একটি রুটি তুলে দেওয়ার জন্য ঘুরছে দ্বারে দ্বারে এবং মায়ের চিকিৎসার জন্য সবার কাছে হাত পাতছে। প্রশ্নের বিপরীতে তার জবাব থাকে সত্যিকারে জীবনে কিছু করতে চাইলে রাস্তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু না করতে চাইলে পাবেন শুধু অজুহাত।

পৃথিবীটা ঠিক তেমনি যেভাবে আমরা দেখি, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য রাস্তার অভাব নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা সেই রাস্তা খুঁজে নিতে আগ্রহী নই। বরং ভাগ্যকে দোষারোপ করি। ঐ যে, পৃথিবী ঠিক তেমনি যেভাবে আমরা দেখি।

মানুষের জীবনধারণ ও উন্নয়নের জন্য কৌশল, সমবেত প্রচেষ্টা, অনুশীলন মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হলেও কর্মকৌশল হিসাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমষ্টিগত উদ্যোগের আবশ্যকতা বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশের ৮০% মানুষ গ্রামে বসবাস করে তাদের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ও কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। তারা উৎপাদিত কৃষি পন্য ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে আলু, পটল, শশা, বেগুন প্রভৃতি উৎপাদন করে কৃষক যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যা আগামী দশ বছরেও পুষে ওঠা সম্ভব নয়। যার ফলে মহাজন ও বিভিন্ন এনজিও (non Government Organization) এর নিকট জিম্মি হয়ে নানাভাবে ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে কৃষক তার কৃষিকাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ঋণের দায় মিটাতে গিয়ে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ক্রমশ ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে। তাদের একাংশ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে শহরের ভাসমান মানুষের দলে ভীরে রিকশা চালিয়ে ও দিনমজুরি করে কোনো রকমের দিনাতীপাত করে চলেছে। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে নেই জীবনের নিরাপত্তা, নেই বাঁচার মতো কোনো বেতন কাঠামো, নেই অবাদ ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা, অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হবার। কখনো কখনো বাধ্য হয়ে শ্রমিকেরা আন্দোলনের পথে নামলে তাদের উপর নেমে আসে আদিম পৈশাচিক নির্যাতন। কাজ করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে কারখানা চাপা পড়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় জীবন দিতে হয়। আবার ন্যায্য বেতনের অভাবে ক্ষুধার আগুনে নিত্য জ্বলতে হয়। আর নিজের শ্রমের মূল্য চাইতে গেলে সইতে হয়। নির্মম নিপীড়ন অকথ্য ভাষা, এমনি এক দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করছে এদেশের দরিদ্র কৃষক শ্রমিক। এ শুধু কৃষক শ্রমিকদের অবস্থা নয় এদেশে কর্মরত বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের এটাই এখন বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৌযান শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, চা শ্রমিক, পাদুকা শ্রমিক, ছ'মিল শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, যে দিকেই তাকানো হোক না কেন সর্বত্রই একই অবস্থা বিরাজমান। বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের ভিন্নতা থাকলেও শ্রেণি বিন্যাসের জন্য সঠিক সংগঠনে সংগঠিত হয়ে মালিক শ্রমিক ধনী দরিদ্র বৈষম্য রোধ ও প্রকৃত মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ যোগ্য নিষ্ঠাবান উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেদের জীবন গড়া একান্ত প্রয়োজন। স্ব-স্ব স্থান থেকে উদ্যোক্তা হওয়া, পরিশ্রমী হওয়া ভাগ্যকে দোষারপ না করি বরং কর্মের মাধ্যমে ভাগ্যকে পরিবর্তন করি, সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে পাশে এবং সুবিশাল অরণ্যের গভীরে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে বিশ্ব নেত্রীবৃন্দ ১৮৯৫ খ্রি. International Cooperative Alliance (ICA) আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা গঠন করে। বাংলাদেশ আইসিএ-এর একটি সদস্য দেশ। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর ১৯০৫ সাল হইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

**আব্দুল ওয়াদুদ রতন:** সভাপতি, এলতা আদর্শ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, কালাই, জয়পুরহাট।

# একটি স্বপ্নযাত্রা

# আমাদের পূর্বসূরি, আমরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম!

রবীন ভাবুক

মানুষ স্বপ্ন দেখে! স্বপ্ন দেখে মানুষ পুলকিত হয়, আবার মন খারাপ বা দুশ্চিন্তাও করে। ঘুমিয়ে বা অবচেতন চিত্তে স্বপ্ন দেখে মানুষের মাঝে এমনই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সেই স্বপ্ন কখনোই বাস্তবতা পায় না। কিন্তু মানুষ যখন বাস্তবতায় থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, আর সেই স্বপ্ন যখন ডানা মেলে বাস্তবতায় রূপ নেয়, সেই স্বপ্নসুখের অনুভূতি যে কতটা হৃদয়স্পর্শী তা কেবল স্বপ্নযাত্রার মানুষগুলোই বোঝে। আর স্বপ্নভঙ্গের মানুষগুলোও বুঝতে পারে স্বপ্নভাঙার নিদারুণ কষ্ট। আজ একটি স্বপ্নের ডানা মেলার গল্প বলার ইচ্ছে:

বছর দুয়েক আগে এক বড়ভাই ফোন দিয়ে দেখা করতে বললো। দেখা করার পর জানতে পারলাম তার স্ত্রীর অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ইতিমধ্যে ঢাকার দুটি নামকরা হাসপাতালে গিয়েছে, ছয় মাসেও অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। তাই খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে ভারতের চেন্নাইয়ে ভালো হাসপাতাল রয়েছে এবং সেখানে খরচও কম। কয়েকদিন আগে তার কাকাকে সেখানে চিকিৎসা করিয়ে এনেছে, সেখানকার চিকিৎসা যেমন ভালো, তেমনি বাংলাদেশে চিকিৎসার খরচের চেয়ে সেখানে যাতায়াতবাবদ সকল খরচ প্রায় অর্ধেক হয়েছে। দাদাও তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে তেমন হিসেবের একটা বিবরণ দিল, তাতে দেখা গেল আসলেই তো, এখানে এই নাম করা প্রাইভেট হাসপাতালের চেয়ে ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করালেই তো ভালো। খরচও কম এবং চিকিৎসাও ভালো। বললাম, তবে তাই করো। সে তখন বললো, ঢাকা ক্রেডিট (দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা) তো হেল্‌থ স্কীম থেকে প্রিমিয়াম অনুসারে

অর্থ সহায়তা করে, আমার আর আমার স্ত্রীরও হেল্থ স্কীম রয়েছে। ভারতে গেলে আমার স্ত্রী কি সেখান থেকে কিছু পাবে। দাদাকে বললাম, তুমি ঢাকা ক্রেডিটে যোগাযোগ করে জেনে নিও, আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি, বাংলাদেশের মানুষের হয়তো আর ভারতে উন্নত চিকিৎসা নিতে এবং এই দেশের প্রাইভেট হাসপাতালের খরচের ভয়ে আর ভারতে যেতে হবে না। কারণ, ঢাকা ক্রেডিট যে উদ্দেশ্য নিয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করছে, তা অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে এবং খুব দ্রুতই বিদেশের উন্নত চিকিৎসার বিকল্প হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। রাজনীতির পালাবদল হয়ে নানা মেরুকরণের মাধ্যমে আজকের বাংলাদেশ। অনেক অনেক চেষ্টা, ব্যর্থতা ও অর্জন নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে পরিচিত একটি নাম।

সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ৫টি মৌলিক চাহিদা নির্দিষ্ট করে নাগরিক উন্নয়নে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এগিয়ে যাচ্ছে। খাদ্যে এসেছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদনেও বিপ্লব এসেছে। বাসযোগ্য নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও সঠিক পরিকল্পনার জন্য তা ঝুঁকিপূর্ণ। শিক্ষার হার বেড়েছে অনেকাংশে। পাশাপাশি চিকিৎসাসেবার উন্নতি হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো যেভাবে চিকিৎসাসেবায় নিজেদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে, বাংলাদেশ এখনো সেখানে থেকে অনেক পিছিয়ে। যার চরম প্রমাণ পাওয়া যায়, করোনা মহামারির সময়ে। তখন বাংলাদেশের জনগণসহ সরকারি সকল পর্যায়ে বুঝিয়ে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা কতটা নাজুক। যদিও কিছু কিছু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং প্রাইভেট হাসপাতাল উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি অভাব রয়েছে আন্তরিকতার। অন্যদিকে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো এতটাই বাণিজ্যিক নীতিতে পরিচালিত হয়, যেখানে সাধারণ মানুষ ভিড়তে পারে না। আর যারা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন, তারাও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বিভিন্ন সময়ে আমরা এর প্রমাণও দেখেছি। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও প্রাইভেট হাসপাতালগুলো শুরুর দিকে তৎকালীন আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে শুরু করলেও, যুগের সাথে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে নতুন করে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি খুব বেশি আপডেট করে না। যে কারণে, দেশের স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ চিকিৎসাসেবা নিতে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান।

২০০০ সালে প্রথম স্বাস্থ্যনীতি এবং ২০১১ সালে দ্বিতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা হলেও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তেমনি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ২০১২ সালে প্রণীত হেলথকেয়ার ফিন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে। স্বাস্থ্য খাতের অবয়ব, কলেবর, কাঠামোগত জটিলতা, ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতাসহ বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার বা নীতিনির্ধারণী মহলের সাথে সমন্বয় করে তেমন অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও অতি মুনাফা লাভের চিন্তায় স্বাস্থ্যসেবার যে উন্নয়ন হওয়ার কথা এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে স্বাস্থ্যখাত নীরবে কাঁদছে। আবার ক্রমাগতভাবে স্বাস্থ্য খাত বিভাজিত হতে হতে একেকজনের নিজস্ব তালুকে পরিণত হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবার জন্য এই বিদেশনির্ভরতা কোনোভাবেই জনগণের স্বাস্থ্য, দেশের অর্থনীতি কিংবা দেশের নিরাপত্তার জন্য শুভ নয়। আর এখানেই নজির সৃষ্টি করতে চলেছে বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গন। সমবায় অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত একটি অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হলো দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা, যা ঢাকা ক্রেডিট নামেই বহুল পরিচিত। আর এই ঢাকা ক্রেডিট সমবায় অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে স্বাস্থ্যখাতে বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি, ঢাকা ক্রেডিটের নির্মিত এই ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের মতো এত সুন্দর পরিবেশ সংবলিত এবং ভালোবাসাপূর্ণ সেবা আর কোনো হাসপাতালে নেই। নতুন নির্মিত হাসপাতালটি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসা শুরু করেছে এবং আর অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক মানের সকল চিকিৎসা দিতে সমর্থ হবে। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমবায় অধিদপ্তর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির সাথে থেকে নিয়মিত তদারকি করেছে। হাসপাতালের ক্যাম্পাসেই ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান।

যেখানে সমবায় প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগণকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল, সেখানে সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানই বৈপ্লবিকভাবে স্বাস্থ্যখাত থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই অবদান রেখে চলেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর নিরলসভাবে পরিচর্যা করে সমবায় অঙ্গনকে দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাত এবং সামগ্রিক উন্নয়নের সূতিকাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

শুরুতে ঢাকা ক্রেডিটের নির্মিত হাসপাতালটি নিয়ে অবতারন করেছি, কারণ, একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান চাইলে অনেককিছুই করতে পারে সেই জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরার জন্য। সমবায় অঙ্গণে ঢাকা ক্রেডিটের অর্জন এবং সফলতার চিত্র দেখলে যে কেউ-ই অবাক হবেন!

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, তৎকালীন আর্চবিশপ লরেন্স এল. গ্রেণার সিএসসি-এর অনুপ্রেরণায় একজন দরদিপ্রাণ সুদূর আমেরিকা থেকে আগত মিশনারী ফাদার চার্লস

জে. ইয়াং সিএসসি কয়েকজন উদীয়মান সমাজসেবককে জড়ো করেন খ্রিষ্টান সমাজের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য। ওই বছরই ৩ জুলাই, ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে মাত্র ৫০ জন সদস্য, ২৫ টাকা মূলধন ও একটি রেজিস্টার খাতা নিয়ে শুরু করেন ঢাকা ক্রেডিটের যাত্রা। ৭০ বছর পর, আজ প্রায় ৪৭ হাজার সদস্যের প্রায় ১৫শ কোটি টাকার অধিক মূলধন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। সদস্যসেবার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বর্ধিত অফিসের পাশাপাশি ১২টি সেবাকেন্দ্র, ২৫টি কালেকশন বুথ, ১০টি নিজস্ব ভবন এবং ১২০০ জন কর্মীবাহিনী নিয়ে সমিতিটি এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

এ ছাড়াও, ঢাকা ক্রেডিটের রয়েছে ৮৬টি প্রডাক্ট এবং প্রকল্প। যার সুফল সমবায়ী ছাড়াও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করতে পারছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো: ডিসি রিসোর্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, আন্তর্জাতিকমানের চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টার, ডিসি বিউটি পার্লার অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, বান্দুরা বহুমুখী প্রকল্পের অধীনে গেস্ট হাউস, ট্রেনিং সেন্টার, কনফারেন্স হল, কমিউনিটি সেন্টার, ডিসি জিম, কালচারাল একাডেমি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার নিমিত্তে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও লোন, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাধনপাড়া ও মনিপুরীপাড়া এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য নন্দা এলাকায় আবাসিক হোস্টেল, স্পেশাল ইংলিশ কোর্স, IELTS, ম্যাকার্থী লাইব্রেরি, জব লিংকিং সেলসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরো অনেক প্রকল্প। অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'কর্মসংস্থান আমাদের লক্ষ্য, আত্মনির্ভরশীল সমাজ আমাদের স্বপ্ন' স্লোগানকে ধারণ করে ঢাকা ক্রেডিট বেকারত্ব দূরীকরণে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখে চলেছে। যার একটি বড় উদাহরণ হলো ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস। প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ সকল ধর্মের বেকার যুবক-যুবতীদের পেশাদার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে গড়ে তুলছে প্রকল্পটি। এ পর্যন্ত ৪১টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩শ'র অধিক নারী-পুরুষ নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দিয়েছে প্রকল্পটি।

সদস্যদের সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে রয়েছে সাধারণ সেভিংস, দীর্ঘমেয়াদি আমানত সুবিধা, মাসভিত্তিক সঞ্চয়, মিলিনিয়ার স্কীম, ডাবল ডিপোজিট স্কীম, অবসর জীবনের নিরাপত্তার জন্য পেনশন বেনিফিট স্কীম (পিবিএস) ইত্যাদি। ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয়মুখী করতে শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় দুটি প্রকল্প বী-সেভার্স ও স্মার্ট-সেভার্স রয়েছে।

ঢাকা ক্রেডিট ডিজিটালাইজেশনের পথে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যে শুরু করেছে নিজস্ব ইআরপি সফট্ওয়ার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, যা ঢাকা ক্রেডিটসহ বিভিন্ন সমবায় সমিতির নিরাপত্তায় স্বল্পমূল্যে ব্যবহার করতে পারছে। রয়েছে নিজস্ব ঢাকা ক্রেডিট অ্যাপ সেবা 'পাশ বই', যেখানে এমএমএস, সংবাদ, নোটিশ, প্রকল্প সেবাগ্রহণ, প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ব্যবস্থাসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে। এমএমএস-এর মাধ্যমে সদস্যগণ এখন অফিসে না এসেও বিভিন্ন ধরনের সেবা- ব্যক্তিগত তথ্য, মানি ট্রান্সফার, বিকাশের মাধ্যমে জমা প্রদান এবং উত্তোলন, ঋণ পরিশোধ, জামিনদারের তথ্য, এটিএম সার্ভিসে কিউআর কোড ব্যবহার করে টাকা উত্তোলনের মতো আধুনিক ও স্মার্ট সুবিধা। উল্লেখযোগ্য একটি সুবিধা হলো নিয়মিত সদস্যগণ এই সার্ভিসের মাধ্যমে যেকোনো সময় ১০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ইনস্ট্যান্ট লোন গ্রহণ করতে পারছেন।

ঢাকা ক্রেডিটই বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রথম এটিএম সার্ভিস চালু করেছে। কর্মএলাকার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে এটিএম বুথ যেখান থেকে সদস্যগণ ২৪ ঘণ্টা টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

সদস্যদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুতকরণ ও তাঁদের জীবন-মানের উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সাধারণ ঋণ, বাড়ি নির্মাণ ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ, ক্রেডিট সিলিং ঋণ, টপ-আপ ঋণ, গাড়ি ক্রয় ঋণ, ভোক্তা ঋণ, দেশে এবং বিদেশে শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা সহায়তা ঋণ, সলভেন্সি ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়িক ঋণ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি।

এসবের পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে ঢাকা ক্রেডিট। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালনসহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মা দিবস পালন, যুব উন্নয়নে সেমিনার ও যুব উৎসবের আয়োজন, জাতীয় সমবায় ও সামাজিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে ঢাকা ক্রেডিট ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ফাদার ইয়াং-এর হাত ধরেই প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়নের যাত্রা শুরু। সেই যাত্রাকে প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশের সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ অবদান রেখে যাচ্ছে। ঢাকা ক্রেডিটের প্রডাক্ট ও প্রকল্পগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে অনুরূপেই অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করছে। বাংলাদেশের সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্ব)' ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিটের শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়াও খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভগুলোর ফেডারেশন 'দি সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাককো) লিঃ' প্রতিষ্ঠায়ও ঢাকা ক্রেডিট অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

ঢাকা ক্রেডিট সব সময় স্বপ্ন দেখে একটি সুখী সুন্দর সমাজ এবং সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন। আমাদের পূর্বসূরি আমাদের এই সফলতায় ধারণ করে এনেছেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আরো সফল ও সুন্দর প্রজন্মের স্বপ্নযাত্রায়!

১৯৮৯ ও ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিট শ্রেষ্ঠ ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করে; এবং শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে সমিতির ৫ জন প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

আজ ঢাকা ক্রেডিট দেশ তথা বিশ্ব সমবায়ের কাছে একটি আস্থা ও নির্ভরতার নাম। ঢাকা ক্রেডিট শুধুমাত্র একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি পরিবার। যার রয়েছে বিশ্বাস, শক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের তীব্র মনোবল। ঢাকা ক্রেডিট সব সময় স্বপ্ন দেখে একটি সুখী সুন্দর সমাজ এবং সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন। আমাদের পূর্বসূরি আমাদের এই সফলতায় ধারণ করে এনেছেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আরো সফল ও সুন্দর প্রজন্মের স্বপ্নযাত্রায়!

**রবীন ভাবুক:** সংবাদকর্মী ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা।

# জাইকা প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

# ময়মনসিংহে “সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগীয় “সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার সমবায় কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম।

জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমবায় অধিদপ্তরে অতিরিক্ত নিবন্ধক (অডিট ও আইন) মো: নবীরুল ইসলাম এবং আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি অনুষদের অধ্যাপক ফকির আজমল হুদা, বিভাগীয় সমবায় কাযালয়ের যুগ্ম নিবন্ধক মো. আব্দুল ওয়াহেদ, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সভাপতি মোঃ নাজমুস সা’দাত।

# সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সালাম এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি) সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এবং আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, বক্তব্য রাখেন। সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (অডিট ও আইন) জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা) জনাব জেবুন নাহার, যুগ্মনিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ঢাকা বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহসভাপতি জনাব কাজী নাজমুস সা'দাত সমাপনী বক্তব্য দেন। কর্মশালায় সমবায় অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিভাগের ১৩ জেলার ৩২ জন কর্মকর্তা ও সমবায় সমিতির ৮০ জন প্রতিনিধিসহ মোট ১১২ জন অংশগ্রহণ করেন।

# ১৭তম আইসিএ-এপি আঞ্চলিক পরিষদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

২৪-২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে  শ্রীলঙ্কা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কোঅপারেটিভসের আয়োজনে ১৭তম আইসিএ-এপি আঞ্চলিক পরিষদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম বড় সমাবেশ। সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমবায় উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, নতুন আঞ্চলিক বোর্ড নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উদযাপন। সমাবেশের বিশেষ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ছিল সেক্টরাল কমিটি ও যুব কর্মশালা, গবেষণা সম্মেলন ও সমবায় ফোরাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফিল্ড ভিজিট।

# দেশব্যাপী ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫ উদযাপন

দেশব্যাপী যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে '৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫' উদযাপিত হয়েছে। এবার দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য: "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"।

শনিবার, ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকার আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে সকালে অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়; পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মো: ইসমাইল হোসেন। পরবর্তীতে সমবায় ভবনের মাল্টিপারপাস হলে তথ্যবহুল ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়, যেখানে বাংলাদেশের সমবায় খাতের অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) বলেন, "সমবায় আন্দোলন হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক মুক্তির এক শক্তিশালী হাতিয়ার 'সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে সমবায়ের সুফল পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।" তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ীদের অবদানের প্রশংসা করেন। জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মুনিমা হাফিজ বলেন, "সমবায় সমিতিগুলো দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি সমবায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সমবায় নীতি ও আদর্শ মেনে চলার আহ্বান জানান।" অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সমবায়ীবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

# পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরীর সাথে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে 'মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী।

সমবায় অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার আয়োজনে সমবায় বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে 'স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে "অনলাইন প্লাটফর্মে অডিট সম্পাদন" বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী।

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জেলা সমবায় কার্যালয় ঢাকাসহ এর আওতাধীন অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের অংশগ্রহণে "অনলাইন প্লাটফর্মে সমবায় সমিতি নিবন্ধন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমবায় ভবন, ঢাকায় Good Neighbors Bangladesh এর সৌজন্যে "সমবায়ে সমৃদ্ধি সফলতার গল্পগুচ্ছ" নামক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

# নরসিংদীতে নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের সমবায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ সেলিম ফকির, এনডিসি গত ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে নরসিংদী জেলা সফর করেন। সেখানে তিনি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কর্তৃক আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ১ মার্চ-২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিন মেয়াদী নীট সুইং মেশিন অপারেশন লেভেল ২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর তিনি ২৬-৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন মেয়াদী সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে সেশন গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে একটি বৃক্ষের চারা রোপন করেন। পরবর্তীতে তিনি জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী কর্তৃক আয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনহাউজ প্রশিক্ষণে সেশন গ্রহণ করেন। তিনি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিমিটেড, মাধবদী, নরসিংদী পরিদর্শন করেন ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও উপস্থিত বিশিষ্ট সমবায়ীদের সাথে সমিতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

# নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের নওগাঁ জেলা সমবায় পরিদর্শন

গত ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জনাব মোঃ সেলিম ফকির, এনডিসি, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা সমবায় কার্যালয়, নওগাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও তিনি জেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা করেন এবং প্রকল্পের ভবিষ্যত কার্যক্রমের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

# আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

২০-২২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা কুড়িল, ঢাকায় ১৩তম আন্তর্জাতিক কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক কৃষি ও প্রযুক্তি মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সমবায় সমিতি অংশগ্রহণ করে এবং সমবায়ীদের উৎপাদিত সুন্দরবনের মধু, যশোরের খেজুরের গুড়, পঞ্চগড়ের সমবায় চা, চট্টগ্রামের মাশরুম, আচার, দিনাজপুরের রপ্তানীযোগ্য কাটারি পোলাওর চাউলসহ বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। আন্তর্জাতিক কৃষি ও প্রযুক্তি মেলায় দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ধরণের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

## বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন

বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলাায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস।

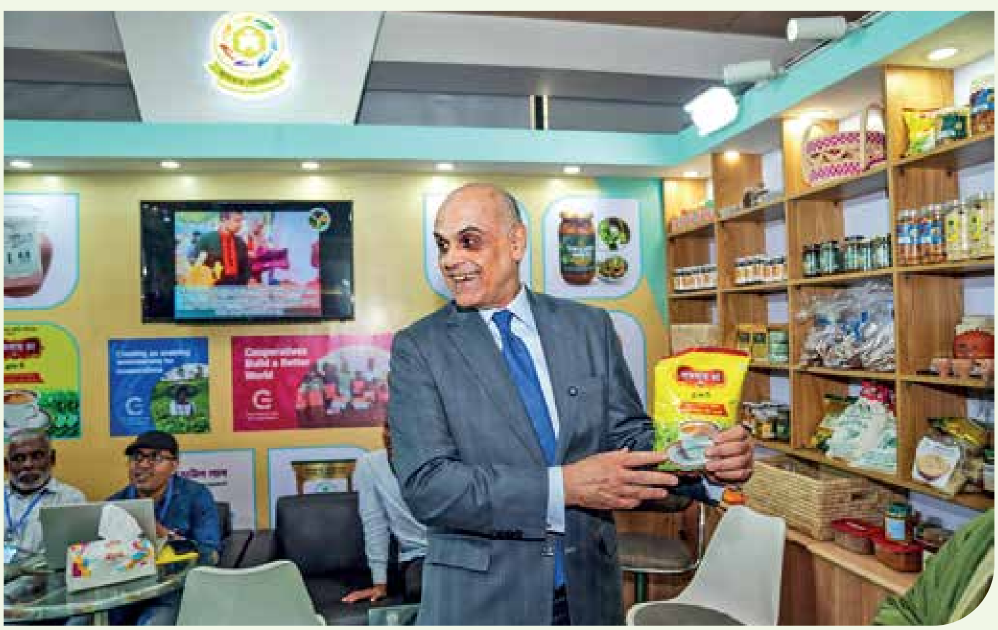

বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শনকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব দীপেন দেওয়ানকে স্যুভেনির প্রদান করা হয়।

# অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এ সমবায় অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব দীপেন দেওয়ান সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন। ১৮দিন ব্যাপী বইমেলা গত ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হয়।

এবারের বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টলে সমবায় সমিতি আইন, সমবায় সমিতি বিধিমালাসহ সমবায় বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অন্যান্য বই প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এ সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সমবায় বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচার ও বিক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হয়েছে।

SAMABAYA ● January-March 2026 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 48111805 l Editor : Fahmida Akhter Lima